পিয়া মুখ চন্দা

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

PIYA MUKH CHANDA

by

Niharranjan Gupta

প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৬৪

প্রকাশক ঃ প্রবীর মিত্র ঃ ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ঃ কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ঃ মানবেন্দ্র পাল (বাচ্চু)

মুদ্রাকর ঃ ভোলানাথ পাল ঃ তনুশ্রী প্রিন্টার্স

৪/১ই, বিডন রো ঃ কলিকাতা-৬

শ্রীমান রবি বসু

কল্যাণীয়েষু—

ভয়াবহ অগ্নির করাল গ্রাস থেকে সমস্ত আশ্রমটার মধ্যে একটি মাত্র ঘরই কোন মতে বেঁচেছিল। এবং ঐটিই একমাত্র পাকা ইটের গাঁথুনির ঘর।

চারিদিকে সমস্ত আশ্রমটার দগ্ধাবশেষ তখনও পড়ে আছে। বাতাসে তখনও একটা পোড়া গন্ধ। নাক জ্বালা করে।

আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সরূপানন্দ স্বামী। সেই পাকা ঘরটিরই দাওয়ায় বসে সামনের অন্ধকারের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে ছিলেন।

দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে তিনি এই আশ্রমটিকে গড়ে তুলেছিলেন, একটি রাত্রের মধ্যেই কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল, সহসা কেমন করে যে আগুন লাগলো আশ্রমের রন্ধনশালায়, এখনো যেন একটা বিস্ময় সরূপানন্দর কাছে !

চার ঘণ্টার মধ্যে পুড়ে সব ছাই হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

একমাত্র সান্ত্বনা যে আশ্রমের ছেলেদের মধ্যে কেউ প্রাণে মারা যায় নি। কিন্তু প্রাণে না মারা গেলেও দুটি ছেলের কোন সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না এখনো পর্যন্ত।

নানা বয়েসী শিশু ও কিশোর মিলে একত্রিশটি ছেলে ছিল আশ্রমে। তাদের সকলের বড় যে দুটি ছেলে অনিমেষ আর মনোহর, সেই দুজনারই কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না এখনো।

মনোহর ছেলেটির পরেই সরূপানন্দর সন্দেহ হয়। খুব সম্ভবত সেই হয়তো ওদের দুজনারাই আকস্মিক নিরুদ্দেশের মূলে রয়েছে।

ইদানীং মনোহরের জন্য সরূপানন্দর চিন্তার অবধি ছিল না।

মনোহরের যখন দেড় বৎসর বয়স সেই সময় একটা খুনের মামলায় মনোহরের বাপ মা ভোলা ও সৌরভীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। সেই সময়ই ভোলার এক প্রতিবেশী অসহায় শিশু মনোহরকে এনে আশ্রমে সরূপানন্দর হাতে তুলে দিয়েছিল।

খুনী মা বাপের রক্ত ছিল মনোহরের শরীরে তাই বোধহয় সরূপানন্দর দীর্ঘদিনের চেষ্টাতেও তিনি, মনোহরের চরিত্রকে তার পৈতৃক চরিত্রগত দুষ্কৃতির অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হননি।

মনোহরের মা বাপের রক্ত হতে পাপের যে বিষ তারও রক্তে সংক্রামিত হয়েছিল, সেই বিষেরই ক্রিয়া ক্রমশঃ মনোহরের বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে একটু একটু করে প্রকাশ পাচ্ছিল তার চরিত্রের মধ্যে। সরূপানন্দর চিন্তা ও আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছিল সেটাই। সর্বদা চোখে চোখে রেখে এবং শাসন করেও

যেন কিছুতেই মনোহরকে আয়ত্বের মধ্যে আনতে পারছিলেন না সরূপানন্দ ইদানীং।

মাত্র গত পরশুই আশ্রমের ফুলের বাগানের চারা ফুলগাছগুলো সমস্ত নষ্ট করে ফেলবার জন্য মনোহর ও অনিমেষকে সরূপানন্দ অনাহারে একটা ঘরের মধ্যে একাকী বন্ধ করে রেখেছিলেন। সেই আক্রোশেই কি ওরা পালাল।

সরূপানন্দর চিন্তা স্রোতে বাধা পড়ল, আশ্রমের একজন শিক্ষক এসে বললেন, একটি ভদ্রলোক ও সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলা গাড়িতে চেপে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। সরূপানন্দ তাদের ঐখানেই নিয়ে আসতে বললেন ?

একটু পরেই স্যুট পরিহিত দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি ও সঙ্গে সর্বাঙ্গ কম্বলে আবৃত অবগুণ্ঠনবতী এক নারী এসে সেখানে দাঁড়ালেন।

মহারাজ!

কে!

আমি! হঠাৎ আশ্রমে আপনার আগুন লেগে পুড়ে যাবার সংবাদ কাগজে পড়ে ছুটে আসছি—আগন্তুক মৃদুকণ্ঠে বললেন।

সরূপানন্দ কোন জবাব দেন না।

কোন প্রাণহানী হয়নি তো মহারাজ ?

না!

সবাই সুস্থ আছে ?

হ্যাঁ!

একটিবার অনিমেষকে দেখতে পারি মহারাজ।

অনিমেষ!

হ্যাঁ, ডাকুন না একটিবার।

কিন্তু—

না, না—পরিচয় তাকে দেব না! সে জানবে না আমরা কে! শুধু আমার এই আত্মীয়াটি দূরে থেকে তাকে একটিবার দেখতে চান!

বসুন আপনারা!

সরূপানন্দের কণ্ঠস্বর যেন কেমন গম্ভীর বিষন্ন।

আগন্তুক ভদ্রলোক ও সঙ্গের ভদ্রমহিলাটি কিন্তু তথাপি বসেন না।

মহারাজ!

আমি শুধু দুঃখিতই নয় লজ্জিতও গত রাত্রে অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে অনিমেষ ও আশ্রমের অন্য একটি ছেলের কোন সংবাদই পাওয়া যাচ্ছে না।

সে কি!

হ্যাঁ, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। —আশে পাশে দু-চার মাইলের মধ্যে সর্বত্র খোঁজ করেছি কিন্তু—

ভদ্রমহিলাটি বোধহয় কাঁপছিলেন, তাই কেবল ভদ্রলোক তাকে তাড়াতাড়ি ধরে দাওয়ায় বসিয়ে দিলেন।

আরো আধঘণ্টা পরে সেই ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এসে নিজেদের গাড়ির সামনে দাঁড়ালেন।

ভদ্রলোক নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে এসেছিলেন।

পার্শ্বে দণ্ডায়মান ভদ্রমহিলা যে তখনো কাঁদছেন বুঝতে কষ্ট হয় না।

আঃ, কাঁদছো কেন, চুপ করো, চুপ করো, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি যেখানেই থাক না সে আমি তাকে খুঁজে বের করবই।

আমি যাব না, এখানেই তুমি আমাকে রেখে যাও।

কি পাগলের মত যা তা বলছো!

না, আমি যাব না। ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমাকে এইখানেই রেখে যাও।

কিন্তু এখানে থাকলেই কি তুমি তার সন্ধান পাবে?

পাব, নিশ্চয়ই পাব! নিশ্চয়ই সে বেশীদূর যেতে পারেনি।

তা যেন হলো। আজ আঠার বছর বলতে গেলে বয়স তার, তাকে তুমি দেখলেই কি চিনতে পারবে?

পারব, আমি তার মা। নিশ্চয়ই তাকে আমি চিনতে পারব।

অবুঝ হয়ো না। চল এখন বাড়িতে। আমি বলছি তাকে আমি যেমন করে হোক খুঁজে বের করবোই।

না, না—আর তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না। তুমি আমাকে মিথ্যে স্তোক দিচ্ছ।

বিশ্বাস করো, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমার ছেলেকে নিশ্চয়ই আমি তোমার কাছে এনে দেব। চল—

ভদ্রলোক হাত ধরে ভদ্রমহিলাকে অতঃপর গাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললেন।

এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলেন।

খানিকটা ধুলো উড়িয়ে গাড়িটা রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বর্তমান কাহিনীর শুরু ঐ ঘটনারই দীর্ঘ নয় বৎসর পরে।

॥ এক ॥

টেলিফোন রিসিভারটা ধীরে ধীরে সুব্রত নামিয়ে রেখে দিল।

দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো, বেলা প্রায় পৌনে চারটা। গ্রীষ্ম-কাল হলেও কিছুক্ষণ পূর্বে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় বেশ একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব বাতাসে।

টালীগঞ্জ থানা ইনচার্জ সুশীল সোম যে রকম জরুরী তাগাদা দিয়েছে এখুনি না বের হয়ে উপায় নেই।

সুব্রত পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো জামা কাপড়টা বদলে নেবার জন্য।

ঘটনাটা সত্যই আকস্মিক।

বিখ্যাত লক্ষপতি লৌহ ব্যবসায়ী নরেন্দ্রনাথ ঘোষের মৃত্যু হয়েছে। আর সুশীল সোমের ধারণা, সেটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, হত্যা অর্থাৎ সাদা কথায় খুন হয়েছেন তিনি।

ফোন করেছে সুশীল নরেন্দ্রনাথের টালীগঞ্জের বাড়ী থেকেই। ঘণ্টাখানেক পূর্বে মাত্র নাকি নরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে তারই বাড়ীর উদ্যানে, সামার হাউসের মধ্যে। লক্ষপতি লৌহ ব্যবসায়ী নরেন্দ্রনাথ ঘোষের নামটা যে সুব্রতর একেবারে অপরিচিত তা নয়।

দু'পুরুষ ধরে ঘোষেদের প্রকাণ্ড লোহার ব্যবসা। শুধু লোহাই নয়, কিছু কোল মাইনসও ধানবাদ ঝরিয়া অঞ্চলে আছে।

ব্যবসা ও বিষয় সম্পত্তি অবিশ্যি বছর দুয়েক হলো তিন ভাগে ভাগ হয়ে ফার্মের পূর্ব নামটাও পাল্টে গিয়ে বর্তমানে দুটো নাম হয়েছে।

নরেন্দ্র ও বিনয়েন্দ্র দুই ভাই-ই বেঁচে ছিলেন। ওদের সবার জ্যেষ্ঠ অমরেন্দ্রর মৃত্যু বাপ মনোরঞ্জন ঘোষের জীবিত কালেই হয়েছিল। তাঁর ওয়ারিশন ছিল তার একমাত্র মেয়ে বেবী অর্থাৎ নমিতা ঘোষ।

মনোরঞ্জন ঘোষ যতদিন বেঁচে ছিলেন ফার্মের নাম ছিল ঘোষ এণ্ড সনস্। কিন্তু বছর দুই পূর্বে মনোরঞ্জন ঘোষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষ এণ্ড সনস্ তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এবং পূর্ব ঘোষ এণ্ড সনস্ নামটাও উঠে গিয়ে তার জায়গায় দুটি ফার্ম দেখা দিল। একটি ফার্মের নাম হলো এন. এন. ঘোষ এণ্ড কোম্পানী, অন্যটির নাম হলো বি. এন ও এন্ ঘোষ এণ্ড কোম্পানী। বি. এন হচ্ছে বিনয়েন্দ্র ও এন্ হচ্ছে বেবীর ভাল নাম নমিতা। কারণ পৃথক হয়ে যাবার পর বেবী তার ছোট কাকাকেই অভিভাবক বলে মেনে নিয়েছিল, নিজে তখনো সাবালিকা হয়নি বলে। মনোরঞ্জন ঘোষের কলকাতা

শহরে দুখানা বাড়ী ছিল। একটি ভাগে পড়েছিল নরেন্দ্রনাথ ও বিনয়েন্দ্রর অন্যটি ভাগে পড়েছিল নমিতার। শেষ পর্যন্ত টালীগঞ্জের বড় বাড়ীটায় বিনয়েন্দ্রর যে অংশ ছিল সেটা নরেন্দ্রনাথকে বিক্রি করে দিয়ে বিনয়েন্দ্র বালীগঞ্জের বাড়ীতে নমিতাকে নিয়ে উঠে গিয়েছিল। নরেন্দ্রনাথের স্ত্রী অনেক দিন আগেই মারা গিয়েছিল একটি মাত্র ছেলে রেখে। বিনয়েন্দ্র বিবাহই করেননি।

ফার্ম ও বিষয় সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে আদালতে যখন মনোরঞ্জন ঘোষের মৃত্যুর মাস দুই পর থেকেই মামলা চলছিল সেই সময়ই সুব্রত সংবাদপত্র মারফৎ সব জেনেছিল। শুধু তাই নয় মনোরঞ্জন ঘোষ বেঁচে ছিলেন যখন ঐ সময় ফার্মের একটা মোটা অংকের একাউণ্টের গোলমালের ব্যাপারে সুব্রতর সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের কিছুটা আলাপ পরিচয়ও হয়েছিল। এবং সেই সময়ই বার দুই সুব্রত মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে ঘোষেদের টালীগঞ্জ ভবনে যাতায়াতও করেছিল।

নরেন্দ্রনাথের বয়েস পঞ্চান্ন পার হয়ে গিয়েছিল। তাহলেও স্বাস্থ্য তাঁর অটুটই ছিল। দেহে কোন প্রকার রোগের বালাই ছিল না।

বলিষ্ঠ দোহারা চেহারা। গায়ের বর্ণ শ্যাম। মাথার চুলে সামান্য পাক ধরেছে। একমাত্র ছেলে রণেন্দ্রনাথ কিছুদিন হলো জার্মানীতে লোহা সম্বন্ধে পড়াশুনা করতে গিয়েছে।

বাড়ীতে দাসদাসী, বাজার সরকার, সোফার, দরোয়ান ও প্রাইভেট সেক্রেটারী নির্মল চৌধুরী। ফোনে সুশীল সোমের সঙ্গে ক্ষণপূর্বে সুব্রতর যা কথাবার্তা হয়েছে নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু সম্পর্কে, ব্যাপারটা যেন একটু রহস্যজনকই।

ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়া ভদ্রলোকের নেশা বা 'হবি' বলতে ছিল দুটি। একটি ফুলের বাগান করা, দ্বিতীয় হচ্ছে ফটোগ্রাফীর।

নরেন্দ্রনাথের টালীগঞ্জের বাড়ীর পশ্চাৎ দিকে প্রায় সাত কাঠা জায়গা নিয়ে একটি ফুলের বাগান।

বহুদিন ধরে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ও সময় দিয়ে নরেন্দ্রনাথ বাগানটিকে তার মনের মত করে সাজিয়ে তুলেছিলেন।

বহু দেশী ও দুমূর্ল্য দুষ্প্রাপ্য নানা প্রকারের নানা জাতীয় বিদেশী ফুলের গাছ ও বীজ এনে বাগানে রোপণ করেছিলেন অনেক দিন ধরে।

সকাল নয়টা থেকে বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত ফার্মের কাজকর্ম ছাড়া বাকী সময়টা নরেন্দ্রনাথের বেশীর ভাগই বাগানের পরিচর্যায় ও ফটোগ্রাফীর নেশা নিয়েই কেটে যেতো।

নিজেতো বাগানের পরিচর্যা করতেনই, চারজন মালীও ছিল বাগানের

রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। মালীরা বাগানের পূব কোণে একটা ঘরের মধ্যেই থাকতো।

ফটোগ্রাফী ও বাগানের নেশা ছাড়াও আর একটি নেশা ছিল নরেন্দ্রনাথের। অতিরিক্ত চা পান করতেন তিনি। দিনে ও রাত্রে তিনি কুড়ি পঁচিশ কাপ চা পান করতেন।

ঘটনার দিনটা ছিল রবিবার।

রবিবার দিনটা নরেন্দ্রনাথের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাগানেই কেটে যেতো। সেদিনও সকাল আটটা থেকে নাকি তিনি বাগানেই ছিলেন।

শরীরটা তত ভাল না থাকায় সেদিন আহার করেননি। বেলা আড়াইটার সময় ভৃত্য নরেশ যখন প্রভুর জন্য চা নিয়ে যায় বাগানে তখন সে জানতো নরেন্দ্রনাথ বাগানের এক কোণে নির্জন সামার হাউসেই আছেন।

বেলা বারটা নাগাদও একবার নরেশ যখন চা নিয়ে যায় তখনও তার প্রভু ঐ সামার হাউসেই ছিলেন।

যে সময় বসে বসে নরেন্দ্রনাথ সামার হাউসের মধ্যে একটা চওড়া পাথরের বেঞ্চের ওপরে কি একটা মোটা ফটোগ্রাফীর বই পড়ছিলেন।

শেষবার চা নিয়ে সামার হাউসে গিয়ে দেখে, নরেন্দ্রনাথ সেই পাথরের বেঞ্চটার ঠিক সামনেই মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন।

প্রথমটায় ব্যাপারটা সে সঠিক বুঝতে পারেনি। তারপর ডাকাডাকি করেও সাড়া না পেয়ে, তার প্রভুকে মেঝে থেকে তুলতে গিয়ে সভয়ে অর্ধস্ফুট একটা চিৎকার করে দু'পা পিছিয়ে আসে। বরফের মত ঠাণ্ডা শরীর। প্রাণের কোন সাড়া নেই। তারপরই সে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে ছুটে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে অন্যান্য সকলকে সংবাদটা দেয়। চাকর বাকররাই ছিল তখন একমাত্র বাড়ীতে। আর ছিল বাজার সরকার ঘোষেদের বাড়ীর বহুকালের পুরাতন কর্মচারী হরিধন বসু। হরিধনই শেষ পর্যন্ত থানায় সংবাদটা পাঠায়।

সুব্রত যখন নরেন্দ্রনাথের পূর্ব পরিচিত বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকার গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো বেলা তখন প্রায় পৌনে পাঁচটা।

গেটের ডানদিকে কালো পাথরের উপর সোনালী জলে খোদাই করে বাংলায় লেখা 'ঘোষ নিবাস'; আর ঠিক তার নিচেই পিতলের প্লেটে লেখাঃ নরেন্দ্রনাথ ঘোষ। নামটি ইংরাজীতে।

গেটের সামনেই একজন লাল পাগড়ী মোতায়েন ছিল। অবিশ্যি গেট রক্ষী শিখ দরোয়ানও রাইফেল কাঁধে প্রহরায় নিযুক্ত ছিল।

লাল পাগড়ীকে পরিচয় দিতেই সে দরোয়ানকে গেট খুলে দিতে বললো। সুব্রত সোজা তার গাড়ি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল।

লাল ছোট ছোট পাথর বিছানো রাস্তা গেট থেকে বরাবর গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত চলে গিয়েছে। সে রাস্তার দুপাশে কেয়ারী করা মেহেদীগাছ। তার গায়ে গায়ে জড়িয়ে উঠেছে সযত্নবর্ধিত, মাধবীর লতা। মধ্যে মধ্যে তার সবুজের গায়ে লাল রক্তের ছিটের মত মাধবী ফুলগুলো ফুটে রয়েছে। তারপর ও পাশে সযত্নবর্ধিত নানা প্রকারের পাতাবাহার ও পুষ্পের সমারোহ।

গাড়ি বারান্দায় গাড়ি এসে থামতেই সামনের ঘর থেকে সেই শব্দে বের হয়ে এলেন ঘোষ বাড়ীর সরকার হরিধনবাবু ও থানা ইনচার্জ সুশীল সোম।

এই যে সুব্রতবাবু, আসুন—আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।

সকলে নরেন্দ্রনাথের অতি আধুনিক কেতায় বহু মূল্যবান আসবাব পত্রে সুসজ্জিত পারলারে গিয়ে প্রবেশ করলো অতঃপর।

ঘরের মধ্যে স্যুট্ পরিহিত আর একজন সুশ্রী দর্শন প্রৌঢ়ও উপস্থিত ছিলেন।

সুশীল সোমই তার সঙ্গে সুব্রতর আলাপ করিয়ে দিলেন।

ডাঃ গণপতি সান্যাল। নরেন্দ্রনাথের বহুদিনকার পারিবারিক চিকিৎসক।

সুব্রত গণপতি সান্যালকে নমস্কার জানিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন করলো, মিঃ ঘোষের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী নির্মল চৌধুরীকে দেখছি না। তিনি কোথায়।

জবাব দিলেন এবারে সরকারমশাই হরিধনবাবু, আজ্ঞে, কি যে বলে তিনি তো আজ্ঞে নেই—

নেই মানে? আমি তো জানতাম নির্মলবাবুই ছিলেন মিঃ ঘোষের যাকে বলে সর্বব্যাপারে—বিশেষ করে তাঁর সামাজিক, লৌকিক ও কৃষ্টির ব্যাপারে দক্ষিণ হস্ত।

সুব্রত কথাটা মিথ্যে বলেনি। কারণ নির্মল চৌধুরী সংক্রান্ত ব্যাপারটা সেবারে যখন এবাড়ীতে যাতায়াত করেছিল তখনই বুঝতে পেরেছিল।

ব্যাঙ্কে প্রচুর অর্থ, গাড়ি, বাড়ী প্রভৃতি জনসমাজে প্রতিপত্তি থাকলেই ধন সম্পদের সৌভাগ্যের ফাউ হিসাবে দেখা দেয় সর্বকালে যে বিশেষ একটা লৌকিক বা সামাজিক প্রতিপত্তি তারই পরিচিতি হিসাবে ক্ষমতা থাকুক বা নাই থাকুক মধ্যে মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে হয় সভাসমিতির প্ল্যাট্‌ফরমে, যেখানে ফুলের মালা গলায় নিয়ে জনগণের হাততালির মধ্যে দিতে হয় কৃষ্টি সম্পন্ন গভীর জ্ঞানোদ্দীপক বক্তৃতা বা ভাষণ। শুধু কি ভাষণ, করতে হয় কত প্রতিষ্ঠানের দ্বারোদঘাটন। দিতে হয় কত মঙ্গলাচারণ ও বাণী। নরেন্দ্রনাথের বেলাতেও স্বাভাবিক নিয়মে সেগুলো বাদ যেতো না তার অর্থের ও প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে। অথচ নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা বা বিদ্যা এতটা ছিল না যাতে করে ঐসব ক্ষেত্রে নিজেকে তিনি সগৌরবে মানিয়ে নিতে পারেন। সেই কারণেই প্রয়োজন হয়েছিল তার নির্মল চৌধুরীর মত একজন যুবকের।

অল্প বয়েসে ইংরাজীতে এম, এ পাশ করবার পর তীক্ষ্নবুদ্ধি সুদর্শন যুবক নির্মল চৌধুরী যখন চাকরির প্রত্যাশায় কলকাতার অফিসে অফিসে ঢু মেরে বেড়াচ্ছে একদিন সেই সময়ই প্রার্থী হিসাবে গিয়ে দেখা করেছিল নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর অফিসে।

পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথের মুখেই ব্যাপারটা আদ্যপান্ত শুনেছিল সুব্রত।

নরেন্দ্রনাথের একটি বিশেষ গুণ ছিল মানুষ চিনবার।

নির্মল চৌধুরীর চেহারা ও কথাবার্তার মধ্যে এমন একটা তীক্ষ্ন বুদ্ধির দীপ্তি দেখে ছিলেন প্রথম দর্শনেই যেটা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনকে আকর্ষণ করেছিল।

কিন্তু সুচতুর ব্যবসায়ী নরেন্দ্রনাথ সেটা তাকে জানতে দেননি ছয়মাস পর্যন্ত।

প্রথম দর্শনের দিন কেবল বলেছিলেন, চাকরি চান?

হাঁ।

কতদূর পড়াশুনা করেছেন।

ইংলিশে এম. এ।

পড়াশুনাটা আপনার দেখছি একটু বেশীই করা হয়ে গেছে।

নির্মল চৌধুরী চুপ করেই ছিল। কোন প্রত্যুত্তর দেয়নি।

ত্রিশ টাকা মাইনে দেবো, ঢুকবেন চাকরিতে?

ঢুকবো। কি কাজ করতে হবে।

রেকর্ড কিপিং।

বেশ।

পরের দিন থেকেই নির্মল চৌধুরী এন. এন. ঘোষ এণ্ড কোম্পানীতে চাকরিতে বহাল হলো, এবং নিয়মিত অফিসে হাজিরা দিয়ে যেতে লাগলো। কাজ করে মনোযোগ দিয়ে। মাস তিনেক বাদে হঠাৎ অফিসে বসে কাজ করছে নিঃশব্দে নিজের টেবিলে ম্যানেজিং ডিরেকটার ঘোষ সাহেবের এক শ্লিপ এলো ঃ দেখা করো।

ম্যানেজিং ডিরেকটারের ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, 'আজকাল' পত্রিকায় বর্তমান অর্থ সমস্যার উপরে আপনিই প্রবন্ধটা লিখেছেন এমাসে।

হাঁ।

আপনার ভাষার বেশ জোর আছে নির্মলবাবু।

এবারেও চুপ করেই রইলো নির্মল চৌধুরী।

কাল থেকে আপনি অন্য কাজ করবেন।

নির্মল চৌধুরী তাকায় ম্যানেজিং ডিরেকটারের মুখের দিকে।

আমার পার্সোন্যাল সেক্রেটারীর কাজ করবেন। কত মাইনা পেলে আপনি খুশি হন।

যা আপনি বিবেচনা করেন।

চারশ টাকা করে পাবেন মাসে। কাল সকালে আটটায় আমার বাড়ীতে আসবেন।

ত্রিশ টাকা থেকে একেবারে একলাফে চারশ টাকায় লিফট্!

তথাপি কোন উচ্ছ্বাস বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়নি সেদিন নির্মল চৌধুরীর ব্যবহারে বা কথাবার্তায়।

যাহোক পরদিন থেকে গত তিন বৎসর যাবৎ নির্মল চৌধুরী নরেন্দ্রনাথের পার্সোন্যাল সেক্রেটারী হিসাবেই কাজ করে আসছিলেন।

পিতার মৃত্যুর কিছুদিন আগেই চৌধুরী নরেন্দ্রনাথের কাছে বহাল হয়েছিল তারপর মনোরঞ্জন ঘোষের মৃত্যুর পর ফার্মের অদল বদল হলেও তার চাকরির কোন অদল বদল হয়নি। পূর্ববৎ সে নরেন্দ্রনাথের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী হিসাবেই কাজ করে যাচ্ছিল।

সেই কারণেই বিশেষ করে নির্মল চৌধুরী সম্পর্কে সুব্রত খোঁজ নিয়েছিল।

হরিধনবাবু বললেন, আজ্ঞে কি যে বলে তিনি দিন দুই হলো ছুটিতে আছেন।

ও!

অতঃপর সুশীল সোমের দিকে তাকিয়ে সুব্রত বলে, চলুন মিঃ সোম, মৃতদেহ তো এখনো সামার হাউসেই আছে, একবার জায়গাটা দেখে আসা যাক।

চলুন।

সকলে গাত্রোত্থান করে।

॥ দুই ॥

সুব্রত, ডাঃ গণপতি সান্ন্যাল, হরিধনবাবু ও ভৃত্য নরেশ সকলে এসে গৃহের পশ্চাতে অকুস্থান উদ্যানে প্রবেশ করলো।

সত্যিই মনোরম উদ্যানটি।

ছোট বড় নানা জাতীয় দেশী বিলাতী ফুল, পাতাবাহার ও নানাজাতীয় ফার্ণ ও অর্কিডের গাছে যেন ছবির মত সাজানো।

আসন্ন সন্ধ্যার ম্রিয়মাণ আলোয় কেমন যেন একটা বিষণ্ণ ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে।

উদ্যানের ভিতর দিয়ে পায়ে চলার সরু কাঁচা মাটির পথ। দুপাশে বাঁশের বেড়া, সেই বেড়ার গায়ে গায়ে লতিয়ে উঠেছে মাধবীলতা ও কি

একপ্রকার বিদেশী লতার প্রাচুর্য্য। তারমধ্যে লাল ও সাদা ফুলের বর্ণ বৈচিত্র।

উদ্যানের মধ্যে কোথায়ও এক ঝাঁক রজনীগন্ধা মাথা তুলেছে, কোথায়ও রক্ত গোলাপের রক্তাভা, কোথায়ও শ্বেত গোলাপের শুভ্রতা, কোথায়ও পাপড়ী মেলা সূর্যমুখীর হরিদ্রাভা, কোথায়ও ক্রিসামথিমাম বা মরণিং গ্লোরির বর্ণ বৈচিত্র। কোথায়ও রঙিন পাতাবাহারের চোখ জুড়ানো শোভা, কোথায়ও নবীন দূর্বাদলের সবুজ আস্তরণ।

মাঝে মাঝে কৃত্রিম ফোয়ারা ঝির ঝির করে জলবিন্দু ছিটুচ্ছে।

সুব্রত যেন মুগ্ধ হয়ে যায় চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

এই মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য ও শান্তির মধ্যে নেমে এসেছে মৃত্যুর ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা।

বিদায়মান সূর্যরশ্মিস্নাত সায়াহ্ন বেলার নীলাকাশের দিকে চোখ তুলে তাকালো সুব্রত।

জীবন ও মৃত্যুর এই যে মর্মান্তিক খেলা এর কি শেষ হবে না কোনদিন।

এমনি করেই কি বার বার পৃথিবীর এই শান্ত সমাহিত রূপ বিকৃত হবে মানুষের দ্বেষ, হিংসা ও নিষ্ঠুরতার মর্মান্তিক আঘাতে আঘাতে।

সহসা সুশীল সোমের কথায় সুব্রতর যেন স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।

এই সেই সামার হাউস সুব্রতবাবু।

চোখ তুলে সামনের দিকে তাকালো সুব্রত।

উপরে খড়ের ছাউনী, পাকা মেঝে ও চারিদিকে কাঠের বেড়া দেওয়া ছোট একখানি ঘর।

ঘরটির সর্বাঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে সবুজ লতা ও লাল ফুলের বর্ণসুষমা।

শিল্পী মনের সবটুকু নিংড়ানো যেন একটুকরো স্বপ্ন।

মধ্যে মধ্যে দেওয়ালে কাচের জানালা, দরজাও কাচের তৈরী।

ভিতরে প্রবেশের কাচের দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ করাই ছিল। দামী বর্মাটিক উডের চমৎকার কাজ করা বিচিত্র ফ্রেমের মধ্যে বসানো ফিকে সবুজ রংয়ের ঘষা কাচ।

দরজার গায়ে ইয়েল লক সিস্টেম।

খোলাই ছিল দরজা, দরজার পাল্লা ঠেলে সর্বাগ্রে প্রবেশ করলেন ভিতরে সুশীল সোম এবং সুব্রতকে আহ্বান জানালেন, আসুন সুব্রতবাবু।

মুগ্ধ বিস্ময় সুব্রত সোমের পিছু পিছু সামার হাউসের মধ্যে প্রবেশ করলো। সামার হাউসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মুহূর্তের জন্য একবার দাঁড়ালো সুব্রত। চারিদিকে একবার তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকালো। তারপর সামনের দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল।

ঘরের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটি চওড়া শ্বেত পাথরের বেঞ্চ ওর

নজরে পড়লো। তার চার পাশে নানা জাতীয় দুষ্প্রাপ্য ফুলের গাছ ভিড় করে আছে।

বৈকালের পড়ন্ত রৌদ্রালোকে সমগ্র ঘরখানির মধ্যে একটা অপূর্ব আলোছায়ার লুকোচুরী যেন। আরো কয়েক পা এগিয়ে যেতেই সুব্রতর নজরে পড়লো সেই শোচনীয় মৃত্যু দৃশ্য। শ্বেত পাথরের বেঞ্চটার ঠিক সামনেই নিচে মেঝের উপরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটা নিষ্প্রাণ দেহ। গায়ে একটা দামী জাপানী সিল্কের কিমানো ও পরিধেয় ঢোলা সিল্কের পায়জামা। একটা হাত দেহের নিচে চাপা পড়েছে অন্য হাতটা পাশে ছড়ানো। ছড়ানো হাতের মুষ্ঠিটা দৃঢ়বদ্ধ।

ভূপতিত নিশ্চল দেহটার চার পাশে নানা বর্ণের পুষ্প সম্ভার যেন ঝুকে রয়েছে বিস্ময়ে সেই নৃশংস ঘটনার সাক্ষী হয়ে।

পায়ে যে ঘাসের চটি ছিল, এখনো তা এক পায়ে আছে অন্য পা থেকে সম্ভবত স্খলিত হয়ে দ্বিতীয় পাটি চটি পাশেই পড়ে আছে।

মৃতদেহের উপর থেকে দৃষ্টি তুলে এবারে তাকালো সুব্রত পাশের শ্বেত পাথরের বেঞ্চটার দিকে।

বেঞ্চের উপর এক পাশে পড়ে আছে কালো মলাটের একখানা বই।

তার পাশেই একটা দামী ছোট ক্যামেরা। একটা মুখ খোলা সেফিল্ডের দামী ছুরি। আশে পাশে কাটা পেন্সিলের কিছু কাঠের চিলতে তার পাশে কতকগুলো চিঠির খাম। ও একটা সাদা পুরু মুখ ছেড়া খাম।

এদিক ওদিক ভাল করে তাকাতে গিয়ে সুব্রতর আরো নজরে পড়লো মৃত-দেহের ঠিক পাশেই পড়ে আছে রোল ফিল্মের একটা মুখ খোলা কাগজের কেস্ ও একটা এ্যালুমুনিয়ামের কেস্। একটা ফিল্ম স্পুল তার পাশে রোল করা। এবং আরো নজরে পড়লো সুব্রতর বেঞ্চটার উপরে, খান কয়েক ইংরাজীতে 'এন' এমবস্ করা দামী সাদা লেটার পেপার! তার পাশে একটা তীক্ষ্ম সুচালু করে কাটা লেড্ পেন্সিল বেঞ্চের উপর পড়ে রয়েছে। এবং বেঞ্চের উপরে পড়ে আছে ছোট একটি কার্ডবোর্ড তৈরী বাক্স। বাক্সটি শূন্য। সুব্রত প্রথমেই নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে মৃতদেহের দিকে নিচু হয়ে ফিল্ম স্পুলটা তুলে নিল। দেখলো সেটা একস্পোজড্ হয়ে গেছে। পকেটে রেখে দিল সেটা। তারপর হাত বাড়িয়ে বেঞ্চের উপর থেকে তুলে নিল চিঠিগুলো। প্রথমেই নজর করে দেখলো ছেঁড়া সাদা খামটা! খামটার উপরে ইংরাজীতে টাইপ করা নরেন্দ্রনাথের নাম!

খামের গায়ে আঁটা রয়েছে ছয় পেনীর একটা ইউ. কে'র ডাকটিকিট।

একটু ভাল করে খামটা পরীক্ষা করতেই সুব্রতর মনে হলো ছয় পেনীর ষ্ট্যাম্পটার উপরে যে ডাকঘরের সীল পড়েছে সেটা এত ছোট যে, ষ্ট্যাম্পটার বাহিরে খামের গায়ে এতটুকু ছাপও পড়েনি। ব্যাপারটা সুব্রতর চোখে কেমন

যেন একটু আশ্চর্য্যই লাগে।

খামটার ভিতরে একটা চিঠি ছিল সেটা টেনে বের করে চোখের সামনে মেলে ধরলো সুব্রত।

ইংরাজীতে টাইপ করা একটা চিঠি।

চিঠিটার বঙ্গানুবাদ করলে এই দাঁড়ায়।

Jhonson Smith & Co.
ABERDEEN

প্রিয় মহাশয়,

ফটো ফিল্ম ও ক্যামেরা সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনি একজন অত্যন্ত উৎসাহী জানিয়া, আমরা নতুন প্রথায় যে ফিল্ম তৈয়ারী করিয়াছি, সেই ফিল্ম একখানি পরীক্ষার জন্য পাঠাইলাম। দয়া করিয়া ফিল্মখানি ব্যবহার করিয়া তাহার ফলাফল জানাইলে আমরা বিশেষ বাধিত হইব। পৃথক রেজিষ্টার্ড পার্শেলে ফিল্ময়ের একটি রোল পাঠানো হইল।

ভবদীয়—
ও. এন. স্মিথ
ম্যানেজার জনসন স্মিথ্ এণ্ড কোং

চিঠিখানা পড়ে আবার ভাঁজ করে খামের মধ্যে ভরে সুব্রত খাম ও অন্যান্য চিঠিগুলো পকেটে রেখে দিল।

ইতিমধ্যে অত্যাসন্ন সন্ধ্যার ধূসর ছায়া সামার হাউসের অভ্যন্তরে চারিদিক অস্পষ্ট করে তুলেছিল।

সুব্রত হরিধনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, এ ঘরে আলোর কোন ব্যবস্থা আছে?

আজ্ঞে না। কি যে বলে, এ ঘরে তো ইলেকট্রিকের কোন কনেকশন নেই।

ও, তা একটা আলোর কোন ব্যবস্থা হতে পারে না?

কি যে বলে, আজ্ঞে একটা হ্যারিকেন বাতি আনিয়ে দিতে পারি। যদি বলেন, বাগানের মালীদের ঘরে আছে।

তাই ব্যবস্থা করুন তাহলে।

যে আজ্ঞে। ....

হরিধনবাবু আলোর ব্যবস্থা করবার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

খানিক পরেই হরিধনবাবু একটা প্রজ্জলিত হ্যারিকেন বাতি হাতে সামার হাউসে এসে ঢুকলেন।

অতঃপর সেই হ্যারিকেনের আলোর সাহায্যে সুব্রত প্রথম অকুস্থানটা ভাল করে যথাসম্ভব পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখলো, তারপর মৃতদেহকে

চিৎ করে দেখতে লাগলো।........

মৃতের মৃত্যু শীতল শক্ত মুখখানার পেশীতে পেশীতে ও শেষ চিরস্থায়ী কুঞ্চনের মধ্যে যেন নিদারুণ একটা যাতনা স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। ওষ্ঠ ঈষৎ দ্বিধাবিভক্ত। এবং সেই দ্বিধাবিভক্ত ওষ্ঠের ফাঁক দিয়ে রক্ত মিশ্রিত খানিকটা গাঁজলা বের হয়ে এসেছে। মুখ ও ওষ্ঠ নীলাভ।

কপালে ও গালের একজায়গায় সামান্য একটু এব্রেশনের চিহ্ন ব্যতীত আর অন্য কোন আঘাতের চিহ্ন পর্যন্ত দেহের কোথায়ও দেখা গেল না।

প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায় তীব্র কোন বিষের ক্রিয়া যেন মৃতদেহের মধ্যে চিহ্ন রেখে গিয়েছে। অর্থাৎ তীব্র কোন বিষেই ঘটেছে আকস্মিক মৃত্যু। সুব্রত এবার ধীরে ধীরে সুশীল সোমের মুখের দিকে তাকালো।

আপাততঃ আজ রাত্রের মত এখানে আর দেখবার কিছু নেই সুশীলবাবু। মৃতদেহ আপনি মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারেন। তবে ঘরটা যেন আন্ডার লক এণ্ড কি থাকে।

তাই থাকবে।

চলুন।

বাড়ীর মধ্যে যেতে যেতে এক সময় সুব্রত ডাঃ সান্যালকেই প্রশ্ন করে, মৃত্যুর কারণ কি বলে আপনার মনে হয় ডাঃ সান্যাল ?

আমার তো মনে হয় কোন পয়েজন।

তাই। মৃদু কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয় সুব্রত।

সকলে এসে আলোকিত পারলারে প্রবেশ করে সোফায় উপবেশন করল।

হরিধনবাবু, আপনাকেই সর্বাগ্রে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। সুব্রত বলে।

হরিধন তাকালো নিঃশব্দে সুব্রতর মুখের দিকে।

আচ্ছা, সর্বশেষ মিঃ ঘোষকে জীবিত দেখেছিল কে।

চাকর নরেশই।

হুঁ। আচ্ছা মিঃ ঘোষের ছোট ভাই বিনয়েন্দ্রবাবুকে দেখছি না, তিনি কি সংবাদটা পাননি।

না এখনো দিইনি।

একটা সংবাদ পাঠানো উচিৎ ছিল। আচ্ছা একটা কথা, বাড়ীতে কি কোন মেয়েছেলে নেই ?

আছেন, বাবুর এক বিধবা মাসতুতো বোন। তিনিই তো গত এক বছর ধরে ভিতর বাড়ীর সব কিছু দেখাশুনা করছেন। জবাব দিলেন হরিধন।

তার সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে ?

খবর দিচ্ছি।

হরিধন একজন ভৃত্যকে ডেকে নরেন্দ্রনাথের বিধবা মাসতুতো বোন বিমলাদেবীকে সংবাদ দিতে পাঠালো।

মিনিট চার পাঁচের মধ্যেই বিমলাদেবী এসে পারলারে প্রবেশ করলেন। দেখলেই বোঝা যায়, বয়স খুব বেশী নয় ভদ্রমহিলার, ত্রিশের কোঠাও উত্তীর্ণ হয়েছেন কিনা সন্দেহ।

গাত্রবর্ণ ভদ্রমহিলার কালোই বলা উচিৎ। তবে চমৎকার দেহ-সৌষ্ঠবে দেহের ঐ কালো রঙটির যেন অপূর্ব এক সমন্বয় ঘটেছে! মাথায় যে পর্যাপ্ত কেশ আছে সল্প ঘোমটার ফাঁক দিয়ে সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। একহারা ছিপছিপে দেহের গঠন। পরিধানে সাদা মিলের সরু কালো পাড় ধুতি। হাতে এক গাছি সোনার চুরি ছাড়া দেহে অন্য কোন আভরণ নেই।

বসুন, নমস্কার।

সুব্রতর আহ্বানে বিমলাদেবী চোখ তুলে বারেকের জন্য তাকালেন এবং সেই মুহূর্তের দৃষ্টিপাতেই বিমলাদেবীর দিকে তাকিয়ে মনে হয় সুব্রতর, চোখের পাতা দুটো ফুলোফুলো। বোধ হয় কাঁদছিলেন।

বসুন!

এবার বিমলাদেবী একটা খালি সোফার পরে বসলেন।

দেখুন বুঝতে পারছি এখন আপনাকে বিরক্ত করা আমাদের উচিত নয়, কিন্তু অনোন্যপায় হয়েই আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে সে জন্য সত্যিই আমরা দুঃখিত বিমলাদেবী!

সুব্রতর কথায় বিমলা তার দিকে মুখ তুলে তাকালেন নিঃশব্দে।

কয়েকটা কথা জানবার জন্যই আপনাকে ডেকে আনিয়েছি! সুব্রত আবার বলে।

এবারে আর তাকালেন না বিমলাদেবী। মাথা নিচু করে পূর্ববৎ বসে রইলেন নিঃশব্দে।

বলছিলাম, সুব্রত এবারে সোজাসুজিই তার প্রশ্ন শুরু করে, আজ শেষ কখন আপনার সঙ্গে নরেনবাবুর দেখা হয়েছিল যদি বলেন!

সকাল সাড়ে সাতটায়! সকালবেলা স্নান সেরে ঘরে বসে চা খাচ্ছিলেন যখন।

একটা কথা, আপনার সঙ্গে সে সময় কি কথা হয়েছিল?

মাথা তুললেন আবার বিমলাদেবী। চোখের কোণে স্পষ্ট চিক্ চিক্ করছে অশ্রুর আভাষ, আলোয় দেখা গেল।

কথা হয়েছিল আপনাদের সে সময়? নিশ্চয়ই কোন।

হাঁ!

ঘরে সে সময় আর কেউ ছিল?

হাঁ, নির্মল ছিল!

নির্মল। চকিতে এবারে সুব্রত বিমলাদেবীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েই ফিরে তাকালো অদূরে দণ্ডায়মান হরিধনবাবুর দিকে। এবং এবারে হরিধনবাবুকেই সম্বোধন করে সুব্রত বললে, তবে যে হরিধনবাবু আপনি একটু আগে বলেছিলেন দুদিন হবে ছুটিতে আছেন নির্মলবাবু ?

আজ্ঞে, কি যে বলে আমি মানে কি যে বলে, তাইতো জানতাম স্যার। থতমত খেয়ে কোনমতে জবাব দেয় হরিধনবাবু।

সুব্রত আর হরিধনবাবুকে দ্বিতীয় প্রশ্ন না করে পুনরায় ফিরে তাকালো বিমলাদেবীর মুখের দিকে। বললে, নির্মলবাবু দুদিনের ছুটিতে ছিলেন আপনি জানতেন বিমলাদেবী ?

না। তবে গতকাল তাকে দেখিনি।

কিন্তু আজ সকালে নরেনবাবুর ঘরে তাকে দেখেছেন ?

হাঁ।

আপনি যখন আজ সকালে নরেনবাবুর ঘরে যান তখন নির্মলবাবু কি করছিলেন ?

কি সব ফটো ও ক্যামেরা সম্পর্কে নির্মল নরেনদাকে বোঝাচ্ছিল।

ফটো ক্যামেরা সম্পর্কে !

হাঁ ! হাতে সে সময় একটা ছোট পার্শ্বেল ও একটা চিঠি ছিল। বলছিল বিলেত থেকে কি একটা নতুন ফিল্ম না কি এনেছে সেটা দিয়ে আজই ফটো তুলে দেখবার জন্য !

ও ! তা নরেনবাবু কি জবাব দিলেন ?

বললেন আজই ফটো তুলবেন।

নির্মলবাবুকে আপনার দাদা খুব ভালবাসতেন না ?

হাঁ। নির্মলের কথা ছিল নরেনদার কাছে যেন বেদবাক্য।

আজ সকালে নির্মলবাবু কখন যান জানেন কিছু ?

না, তা ঠিক বলতে পারি না। সংসার খরচের কিছু টাকার প্রয়োজন সেই কথাই বলতে গিয়েছিলাম। কথা বলেই আমি ঘর ছেড়ে চলে যাই। তবে—কি যেন বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ইতস্ততঃ করে থেমে গেলেন বিমলাদেবী।

কি যেন আপনি বলতে বলতে থেমে গেলেন ? সুব্রত সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে।

না, মানে—নির্মলকে আমি—

বলুন ? থামলেন কেন ?

বেলা তখন দেড়টা কি পৌনে দুটো হবে, আমার ঘরের দোতলার জানালার সামনে আমি সে সময় দাঁড়িয়েছিলাম, দেখেছিলাম তাকে বাগানের সেই ঘরটা থেকে বের হয়ে যেতে—

নির্মলবাবুকে। ঠিক চিনতে পেরেছিলেন তাকে বিমলাদেবী? সুব্রত তীক্ষ্ন স্পষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

এই কয় বছর থেকে তাকে দেখছি এবাড়ীতে বলতে গেলে প্রায় সর্বক্ষণই। চিনতে পারবো না কেন? তাছাড়া দোতলার আমার ঘর থেকে নিচের বাগানের সেই ঘরটা তো খুব স্পষ্টই দেখা যায়।

হুঁ। নির্মলবাবুকে তাহলে দেড়টা কি পৌনে দুটোর সময় আন্দাজ আপনি বাগানের সামার হাউস থেকে বের হয়ে যেতে দেখেছেন?

হাঁ, যেন একটু বেশ জোর পায়েই সে সেই ঘর থেকে বের হয়ে চলে গেল দেখলাম।

এবারে সুব্রত হরিধনবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, আপনারা তাহলে নির্মলবাবুকে আজ এ বাড়ীতে আসতে দেখেননি?

আজ্ঞে না। কি যে বলে, দেখলে বলবো না কেন বলুন?

চাকর বাকররাও কেউ দেখেনি?

তা বলতে পারি না।

সুশীলবাবু, আপনি এবাড়ীর সকলের জবানবন্দী নিয়েছেন?

হাঁ—নিয়েছি।

দারোয়ানের?

হাঁ।

তাকে একবার আর চাকর বাকরদের প্রত্যেককে আবার একবার জিজ্ঞাসা যদি করেন তারা আজ কেউ নির্মলবাবুকে দেখেছেন কিনা?

নিশ্চয়ই।

সুশীল সোম ঘর থেকে তখুনি বের হয়ে গেলেন।

বিমলাদেবী, আপনি এখনো শুনেছেন কিনা জানিনা, খুব সম্ভবত নরেনবাবুর মৃত্যু হয়েছে তীব্র কোন বিষের ক্রিয়ায়।

য়্যাঁ—একটা তীক্ষ্ন আর্তস্বর যেন অস্ফুটে বের হয়ে এলো বিমলাদেবীর কণ্ঠ হতে।

হাঁ। তাকে তীব্র কোন বিষ প্রয়োগেই হত্যা করা হয়েছে।

বিষ! কি বলছেন এসব?

ময়না তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত অবিশ্যি সঠিক জানা যাবে না, তবে আমাদের ধারণা এই। সুব্রত জবাব দেয়।

বিষ! নরেনদাকে বিষ দিয়ে খুন করেছে। না, না—তা কি করে হবে। তাঁর মত লোককে কেউ বিষ দিতে পারেনা। তার তো কেউ শত্রু ছিল না। বিনুদা, যার সঙ্গে তার পৃথগান্ন হয়ে গেল সেও যে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসত নরেনদাকে। ঝি চাকর বাকর পর্যন্ত তাকে ভালবাসত যে তার মিষ্টি ব্যবহারের জন্য। একটানা কথাগুলো বলে গেলেন যেন ঝোকের মাথায় উত্তেজনার মুখে

বিমলাদেবী !

ঠিক ঐ সময় সুশীল সোম এসে আবার ঘরে ঢুকলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন সুশীলবাবু, সুব্রত প্রশ্ন করে।

হাঁ ! কেউ দেখেনি আজ তাকে এবাড়ীতে আসতে।

দারোয়ানও না ?

না।

সুব্রত এবার বিমলাদেবীর দিকে চেয়ে বললে, আচ্ছা আপনি এখন যেতে পারেন বিমলাদেবী।

বিমলাদেবী ঘর থেকে চলে গেলেন।

সুব্রত অতঃপর বললে, নরেশ চাকরকে ডাকুন তো একবার এঘরে সুশীলবাবু।

চাকর বাকরের দল সব যেন জুজুর ভয়ে জড়সড়ো হয়ে এবাড়ীতে পুলিশের পদার্পণ অবধি পারলারের বাইরে বারান্দার একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল।

ডাকতেই নরেশ এসে ঘরে ঢুকলো।

বয়স চল্লিশের বেশী হবে না। হাড়গিল্লে প্যাটার্ণের চেহারা। তবে বড়-লোকের বাড়ীর বিশেষ করে কর্তার খাস চাকর ছিল বলেই বোধহয় বেশ-ভূষায় একটা ছিমছাম ও ভব্যতা।

তোমার নাম নরেশ ?

আজ্ঞে হুজুর। সভয়ে প্রশ্নকারী সুব্রতর দিকে মুখ তুলে তাকালো নরেশ

কতদিন এবাড়ীতে চাকরি করছো ?

তা হুজুর আট বছর হবে।

পুরানো লোক তো তুমি তাহলে !

আজ্ঞে ?

আচ্ছা নরেশ, বেলা আড়াইটা নাগাদ যখন তুমি চা নিয়ে যাও তখনতো দেখো যে তোমার বাবু জীবিত নেই তাই না ?

আজ্ঞে !

তার আগে কখন গিয়েছিলে ?

বারটায় একবার চা দিয়ে এসেছিলাম।

সে সময় মনে আছে তোমার বাবু কি করছিলেন ?

বই পড়ছিলেন !

আজ তো রবিবার, ডাক মানে ডাকের চিঠি, আজ কখন এসেছিল আর কে সেগুলো বাবুকে পৌঁছে দেয়। তুমিই কি ?

আজ্ঞে না তো ! চিঠি তো এসেছে বিকেল চারটায়, সে সব চিঠিপত্র তো বাবুকে দেওয়াই হয়নি। তাছাড়া চিঠিপত্র সব বাবু সাধারণতঃ রাত্রে শোবার

আগে দেখতেন, সেই সময়ই দেওয়ার অর্ডার ছিল।

ও। আচ্ছা তুমি যখন বারটার সময় চা দিতে যাও বাবুর সামনে বেঞ্চে কোন চিঠিপত্র দেখেছিলে ?

আজ্ঞে নাতো।

ঠিক মনে আছে তোমার ?

আজ্ঞে, কোন চিঠিপত্র বাবুর সামনে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।

নির্মলবাবুকে আজ কোন্ সময় এবাড়ীতে দেখেছো ?

না।

আচ্ছা যাও।

এবার সুব্রত সুশীল সোমের দিকে তাকিয়ে বললে, আমার আর বিশেষ কিছু জিজ্ঞাস্য নেই আপাততঃ এবাড়ীর কাউকেই। আপনার যদি কিছু কাজ বাকী থাকে তো সেরে নিতে পারেন মিঃ সোম।

কিন্তু ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলেন সুব্রতবাবু। সুশীল সোম প্রশ্ন করে।

মিঃ ঘোষ বিষ প্রয়োগে নিহত হয়েছেন আপাততঃ এইটুকুই যা বুঝতে পারছি সুশীলবাবু, তার বেশী কিছু নয়। আচ্ছা আজকের মত এবারে আমি বিদায় নেবো। কাল সন্ধ্যার দিকে যাবোখন আপনার ওখানে।

সুব্রত অতঃপর বিদায় নিয়ে এসে তার অপেক্ষামান গাড়িতে উঠে বসে ষ্টার্ট দিল।

॥ তিন ॥

পরের দিন সন্ধ্যার দিকে সুব্রত কিরীটির বাড়ীতে গিয়ে দেখে কিরীটি তার দোতলার ষ্টাডিতে সোফার পরে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কি একখানা বই পড়ছে ক্রিমিনোলজি সম্পর্কে। বৈকালের দিকে আজও এক পশলা বৃষ্টি ও ঝড় হয়ে গিয়েছে। বাতাসে একটা ঠাণ্ডার মৃদু আমেজ।

পদশব্দে মুখ না তুলেই কিরীটি মৃদু কণ্ঠে বললে, আয় সুব্রত বোস।

সুব্রত এগিয়ে গিয়ে একটা সোফার পরে বসে পড়লো।

তারপর কিছুক্ষণ দুজনাই চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পরে কিরীটিই হাতের বইটা মুড়ে কোলের উপর রেখে, সম্মুখে সোফার পরে উপবিষ্ট সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, তারপর। মুখটা অমন গোমড়া করে রেখেছিস কেন ?

আজকের সংবাদপত্রে ঘোষ নিবাসের মার্ডারের সংবাদটা পড়েছিস ?

হাঁ, দেখছিলাম বটে।··· আজ সকালে সুশীল সোমও এসেছিলেন।

সুশীল সোম।

হাঁ। তার মুখেই শুনলাম তোকে নাকি সে গতকাল ডেকেছিল!

হাঁ। ব্যাপারটা বেশ একটু জটিল বলেই মনে হচ্ছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্টেও পটাশিয়াম সায়ানাইড পাওয়া গেছে।

সুশীলও তাই বলে গেল। তা তোর কি মনে হচ্ছে?

সুব্রত কিরীটির সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললে, এই দেখ্ এগুলো কাল মৃতদেহের সামনে অকুস্থানে পাওয়া গেছে। বলতে বলতে সুব্রত একে একে তার পকেট থেকে এ্যালুমিনিয়াম কেসটা, কাগজের কভার কেসটা, ছোট কার্ড বোর্ডের পার্শেল বাক্সটা, ফিল্ম স্পুলটা, পেনসিলটা ও ছুরিটা বের করে কিরীটির সামনে নামিয়ে রাখল। এবং অন্য পকেট থেকে সর্বশেষে দামী ছোট ক্যামেরাটাও বের করে রাখলো টেবিলের পরে।

কিরীটি প্রথমেই ক্যামেরাটা তুলে নিয়ে হাতে নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো, অত্যন্ত শক্তিশালী লেন্সযুক্ত দামী লাইকা ক্যামেরা। কিছুক্ষণ ধরে ক্যামেরাটা দেখে একপাশে সেটা নামিয়ে রেখে ফিল্ম স্পুলটা হাতে তুলে নিল।

ফিল্মটা দেখছি ডেভেলপ করেছিস? প্রিন্ট্ করেছিস?

হাঁ! এই যে—সুব্রত পাঁচটা প্রিন্ট্ একটা খামের মধ্যে থেকে এগিয়ে দিল। প্রিন্ট্গুলোর পশ্চাতে ক্রমিক নং পেনসিলে লেখা। সাতটা ফিল্ম একেবারে এক্সপোজই করা হয়নি দেখা গেল। এক এক করে কিরীটি প্রিন্ট্গুলো দেখতে লাগলো।

প্রথম ছবিটা একটা গাছের প্রস্ফুটিত একটি ফুল সমেত, দ্বিতীয়টিও একটি টবের গাছের, তৃতীয়টি একটা মস্ত বড় ফোটা ডালিয়া ফুলের। চতুর্থও অন্য একটি ফার্ণ জাতীয় লতার এবং পঞ্চমটি একটি স্ত্রীলোকের। প্রথম চারটি প্রিন্ট্ বাঁ হাতের মধ্যে রেখে পঞ্চম প্রিন্ট্টি চোখের সামনে তুলে ধরলো কিরিটি।

বেঞ্চের ব্যাকে দু'হাত রেখে সামনের দিকে ঝুকে দাঁড়িয়ে আছেন মহিলা। মাথার গুণ্ঠন খসে পড়েছে। অধরে একটা চাপা হাসির বিদ্যুৎস্ফুরণ!

হঠাৎ পাশ থেকে সুব্রতই বললে, বিমলাদেবী।

বিমলাদেবী! অর্ধস্ফুট কণ্ঠে নামটা উচ্চারণ করে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো কিরীটি সুব্রতর মুখের দিকে।

হাঁ! নরেন্দ্রনাথের আশ্রিতা বিধবা মাসতুতো বোন। বলে সংক্ষেপে বিমলা-দেবী সম্পর্কে গতকাল যতটুকু সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছিল বলে গেল।

হঠাৎ সুব্রতর কথা শেষ হলে কিরীটি প্রশ্ন করলো, তাহলে নির্মল চৌধুরীর কোন সংবাদ এখনো পাসনি?

না।

বিমলাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিসনি, কোথায় তার যাওয়া সম্ভব বা কোথায়

গেলে তাকে পাওয়া যেতে পারে? কিরীটি আবার প্রশ্ন করে।

না। কিন্তু—

যাকগে। বলে এবারে হাত বাড়িয়ে ছুচালো করে কাটা পেনসিলটা তুলে নিয়ে বার দুই সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সামনের টেবিলের উপর রেখে দিয়ে চিঠিগুলো তুলে নিল। একটার পর একটা চিঠিগুলো পড়ে খামগুলো পরীক্ষা করে সাদা মুখ ছেঁড়া খামটা হাতে নিয়ে নাড়া চাড়া করতে করতে বললে, এ চিঠিটা পোষ্টমার্ক নিয়ে একটা ছয় পেনির ফরেন ষ্ট্যাম্প আঁটা থাকলেও এটা কিন্তু ডাকে আসেনি বলেই আমার বিশ্বাস সুব্রত।

কি বলছিস কিরীটি।

হাঁ, ভাল করে টিকিটের উপর এর ডাকঘরের ছাপটা পরীক্ষা করলেই তোর ব্যাপারটা চোখে পড়বে। তাছাড়া আরো একটা ব্যাপার তোর নজরে পড়া উচিত ছিল।

কি!

ভারতবর্ষের কোন ডাকঘরেরই কোন ছাপ পড়েনি এ চিঠিটায়। এতো হতে পারে না। ভারতবর্ষে এসে ভারতের কোন ডাকঘরেরই ছাপ পড়বে না, ডাকঘরের আইনের এটা অন্তত বিপক্ষে।

সত্যিই তো ব্যাপারটা আমার নজরে পড়েনি।

তাহলে আমাদের বিমলাদেবী ও এই চিঠির কথা বাদ দিলে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষের হত্যার ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে?

কিন্তু নির্মল চৌধুরী? সুব্রত বাধা দিয়ে বলে।

হাঁ, তার কথাটাও অবশ্য মনে রাখতে হবে, বলে কিরীটি কিছুক্ষণের জন্য দুটি চক্ষু মুদ্রিত করে যেন কি ভাবে। তারপর আপন মনেই মৃদু কণ্ঠে একসময় বলতে শুরু করে: সুস্থ, ধনী, সুখী, প্রতিপত্তিশালী এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক—যার বাজারে কোন দেনা ছিল না, ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারেও কোন শত্রু ছিল বলে জানা যায় না। এবং একমাত্র ঐ বিধবা মাসতুতো ভগ্নী বিমলা-দেবীর গৃহে উপস্থিতি ছাড়া বাকী সব গৃহে কর্মচারী ও মাইনে করা আশ্রিতের দল ছিল, তিনি নিহত হয়েছেন তীব্র বিষ পটাশিয়াম সায়ানাইডের ক্রিয়ায় তারই বাগান বাড়ীর নির্জন সামার হাউসে। বেলা বারটা পর্যন্তও যে লোকটিকে জীবিতাবস্থায় তার ভৃত্য নরেশ দেখেছে, বেলা আড়াইটার সময় তাকে দেখা গেল মৃতাবস্থায় মেঝের উপর পড়ে থাকতে ঐ সামার হাউসেই।

সুব্রত হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে, কিন্তু একটা কথা ভুললে চলবে না, বেলা দেড়টা থেকে পৌনে দুইটার মধ্যে নির্মল চৌধুরীকে বাগানের সামার হাউস থেকে বের হয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল।

কিরীটি এবারে সঙ্গে সঙ্গেই মৃদু কণ্ঠে বললে, না ভুলিনি, আর তাকে বের হয়ে যেতে দেখেছেন তোমার বিমলাদেবী। যাহোক শ্রীমতী বিমলা-

দেবীর কথা যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া হয় তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, একমাত্র ঐ নির্মল চৌধুরী একবার ও ভৃত্য নরেশ বেলা বারটার পর মাত্র একবারই সেখানে প্রবেশ করেছে দ্বিতীয় ব্যক্তি।

নির্মল চৌধুরীর ব্যাপারটা তুই যেন অত্যন্ত হালকাভাবেই নিচ্ছিস বলে মনে হচ্ছে কিরীটি।

হালকাভাবে, আদপেই না। rather he is the most important clue এই হত্যার ব্যাপারে—বলে একটা সিগার পাশের চামড়ার বাক্সটা থেকে তুলে নিয়ে সেটায় অগ্নি সংযোগ করে, গোটা দুই টান দিয়ে কিরীটি আবার তার বক্তব্য শুরু করে, তোকে তো কতবার বলেছি সুব্রত আর তুই প্রমাণও পেয়েছিস, এ ধরণের মৃত্যু সর্বক্ষেত্রেই পশ্চাতে তার পথ-রেখা এঁকে দিয়ে যায় বা কোন না কোন চিহ্ন রেখে দিয়ে যায়।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে খুনী তো দেখা যাচ্ছে কোন রকম চিহ্নই রেখে যায়নি। সুব্রত বলে।

একেবারে রেখে যায়নি বলতে পারিস না!

মানে ?

বিমলাদেবী, তার আশপাশেই ভাল করে তোর নজর দিয়ে দেখতে হবে। আর সেই সঙ্গে এ ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির সাইকোলজিও তোকে জানতে হবে।

সাইকোলজি ?

হ্যাঁ, এই হত্যার মূলে পেঁছাতে হলে তোকে অনেক কিছুই ভাবতে হবে। প্রথমতঃ নরেন্দ্রনাথ সত্যি সত্যিই নিহত হয়েছেন, না তাঁর মৃত্যুটা নিছকই একটা দুর্ঘটনা বা এ্যাকসিডেণ্ট্ মাত্র না দুটোর একটাও না, তিনি আত্মহত্যাই করেছেন।

কিন্তু—

বাধা দিয়ে এবারে কিরীটি বলে, ব্যাপারটা অবশ্যই আত্মহত্যা নয়। কারণ এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তার ব্যবসা যথেষ্ট ভাল ভাবেই চলছিল, কেউ তার শত্রু ছিল না বলেই আমরা জেনেছি—যার ফলে তার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠতে পারে। কাজেই not a case of suicide। Next we come to accident—কোন কারণে ভুলে যদি তিনি পটাসিয়াম সায়ানাইড্ খেয়ে থাকেন। কিন্তু এই পেনসিলটার দিকে চেয়ে দেখ। যে লোক এমন Sharp করে পেনসিলের ডগা বানাতে পারে তার প্রকৃতি যে খুব অন্যমনস্ক নয় সহজেই আমরা ভেবে নিতে পারি। তাছাড়া অত বড় একটা বিজ্নেস যে অমন সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারে সে অন্যমনস্ক প্রকৃতির হবে ভাবটাও something ridiculous নয় কি ? অতএব দুর্ঘটনা বা accident ও আত্মহত্যা নয় যখন সেক্ষেত্রে বাকী থাকলো হত্যা। অর্থাৎ তিনি কারো দ্বারা নিহত হয়েছেন বা কেউ তাকে হত্যা করেছে। এবং এও আমরা Post mortem

reportএ যে পাচ্ছি মৃত্যুর কারণ পটাসিয়াম সায়ানাইড্। কিন্তু এমন কোন সূত্র মৃতদেহ পরীক্ষা করে বা অকুস্থান থেকে পাচ্ছি না যা থেকে প্রমাণ হতে পারে যে তাকে কেউ জোর জবরদস্তি করে বিষপ্রয়োগ করেছে। বরং অকুস্থানে এবং মৃতদেহে কোনরূপ struggleএর চিহ্ন না থাকায় এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে, তীক্ষ্ণধী বুদ্ধিমান rather I should say চতুর কোন লোক অত্যন্ত tactfully পটাসিয়াম সায়ানাইড্ বিষপ্রয়োগে তাকে হত্যা করেছে। এবং খুব সম্ভবত the man behind হত্যার ঠিক সময়টিতে victim-এর ধারে কাছে তো ছিলই না বরং was at a long distance away.

কিরীটির শেষের কথায় সুব্রত যেন বেশ বিস্মিত না হয়ে পারে না। বলে, মানে, কি বলতে চাস তুই!

প্রত্যুত্তরে কিরীটি নিঃশব্দে মৃদু হেসে সামনের টেবিলের পরে রক্ষিত ফিল্মের এ্যালুমিনিয়ামের শূন্য কেসটা হাতে তুলে নিয়ে তার গায়ের adhesive tapeটা সরু পেনসিলটার ডগার সাহায্যে সামান্য একটু তুলে কণ্ঠস্বরে একটু যেন রহস্য মিশিয়ে বললে, আচ্ছা এই কেসের গায়ে এই adhesive tapeটা সম্পর্কে কিছু মনে হয় তোর ?

ঐ টেপ্‌টা ?

হাঁ!

কি আবার মনে হবে! Is there anything abnormal ?

আচ্ছা নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু সংক্রান্ত ব্যাপারে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি বিশেষদের কথা ছেড়ে দিলে স্বভাবত আমাদের দৃষ্টি আর কোন্ কোন্ বস্তুর প্রতি আকর্ষিত হতে পারে বলে তোর মনে হয় ?

কেন ঐ চিঠিপত্র, ফিল্মের প্রিন্ট্—

বেশ। চিঠির কথাই যদি ধরা যায় তো দেখা যাচ্ছে স্মিথ কোম্পানীর ঐ চিঠিটির সঙ্গে ঐ প্রিন্টের নেগেটিভের একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। জনসন স্মিথ এণ্ড কোম্পানীর চিঠিতে অনুরোধ জানাচ্ছে নরেন্দ্রনাথকে, একটা ফিল্মের স্পেসিমেন পাঠিয়ে ফটো তুলে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য যার বিশেষ হবি হচ্ছে ছবি তোলা। এবং ঐ খালি এ্যালুমিনিয়ম কেসটা যখন অকুস্থানে পাওয়া গেছে, সহজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে common sense এর সাহায্যে যে, নেগেটিভ্ ফিল্ম রোলটা ঐ কেসের মধ্যেই প্রেরিত হয়েছিল— কেমন কিনা ?

তা হতে পারে। মৃদু কণ্ঠে সুব্রত জবাব দেয়।

শুধু ঐ এ্যালুমিনিয়ম কেস ও তার গায়ে adhesive tapeটাই নয়, ফিল্মটা exposed হবার পর developএর আগে ফিল্মটাকে রোল করে যাতে সেটা কোন রকমে আলোর সংস্পর্শে না আসে সেজন্য ফিল্ম রোলের সঙ্গে সঙ্গে যে কালো রংয়ের কাগজটা জড়ানো থাকে তার শেষ প্রান্তে এবং কাগজের

অংশে যে শুকনো আঠা লাগানো থাকে, যেটা সাধারণত exposed ফিল্মকে রোল করে আমরা জলে ভিজিয়ে বা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মুখের থুতুর সাহায্যেই ভিজিয়ে এঁটে দিই, সেই আঠা লাগানো কাগজের অংশটা সেটাও চাই আমাদের।

ডেভালাপ তো আমি নিজেই করেছি, সে কাগজটাও আছে। এনে দেবোখন।

আরো একটা সংবাদ চাই।

কি ?

এ্যাবার্ডিনে Jhonson Smith & Co. নামে ইউরোপে কোন প্রতিষ্ঠান আছে কিনা, আর থাকলে তারা ঐ ধরণের চিঠি নরেন্দ্রনাথকে লিখেছিল কিনা।

বেশ। আর কিছু ?

আপাততঃ আর কিছু নয়। অবিশ্যি ইতিমধ্যে যদি নির্মল চৌধুরীর কোন সংবাদ পাস তো—

পাবো বলে মনে হচ্ছে না।

কেন ? লোকটা উবে গেছে নাকি !

প্রায় তাই !

কি রকম ?

টালায় ইন্দ্রবিশ্বাস রোডে তাঁর এক মাসীর কাছেই নির্মল থাকতো কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানলাম গতকাল ভোরবেলা সেই যে সে বাড়ী থেকে বের হয়ে এসেছে আর সে ফেরেনি আজ বিকাল পর্যন্তও। তবে একজনকে সে বাড়ীর প্রহরায় রাখা হয়েছে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য। কোন রকম সংবাদ থাকলে পেতে দেরি হবে না।

॥ চার ॥

সত্যিই, নির্মল চৌধুরীর সংবাদ পেতে খুব বেশী দেরি হলো না সুব্রতর। এবং শুধু সংবাদই নয় তার সেই সংবাদের সঙ্গে এলো আরো এক অভাবিত মৃত্যু সংবাদ। নরেন্দ্রনাথের অফিসের ম্যানেজার শ্রীনাথ করের মৃত্যু সংবাদ।

একটানা চলতে চলতে যেখানে মসৃণ মেটাল বাঁধানো ব্যারাকপুর ট্রাংক রোডটা হঠাৎ বাঁদিকে একটা বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের দিকে, সেই সংযোগ স্থল থেকে কিছুটা এগিয়ে রাস্তার ডান দিকে পরের দিন সকালে আবিষ্কৃত হলো স্যুট পরিহিত রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ নরেন্দ্রনাথের অফিস ম্যানেজার শ্রীনাথ করের মৃতদেহটা ও তারই পাশে অজ্ঞান অচৈতন্য নির্মল

চৌধুরীকে পড়ে থাকতে দেখা গেল। এবং তার পাশে পড়েছিল একটি ছয় চেম্বারের ওয়েভারলী রিভলভার। ব্যাপারটা অবিশ্যি কিছুটা আকস্মিক ভাবেই আবিষ্কার করেছিল পানিহাটি থানার একজন এ. এস. আই, শেষ রাত্রের দিকে পুলিশ ট্রাকে করে ঐ পথে একটা তদন্ত সেরে ফিরবার সময়।

সকাল নয়টা নাগাদ সুশীল সোমের কাছ থেকে টেলিফোনে সংবাদটি পেয়েই সুব্রত পানিহাটি থানায় চলে যায়।

মৃতদেহ এক পাশে থানার বারান্দায় ঢাকা দিয়ে রাখা হয়েছে।

নির্মল চৌধুরীরও জ্ঞান ফিরে এসেছে তখন।

রুক্ষ এলোমেলো চুল, জামা কাপড়ে কাদা ও রক্তের দাগ। পায়ে কাবুলী সাণ্ডেল। পরিধানে ধুতি ও পাঞ্জাবী। বসে আছেন একটা চেয়ারের উপরে নিঃশব্দে মাথা নিচু করে নির্মল চৌধুরী। ঘরে ঢুকে কয়েক মুহূর্ত নির্মল চৌধুরীর দিকে চেয়ে সুব্রত হাত বাড়িয়ে সামনের টেবিলের পর থেকে প্রথমেই অকুস্থানে যে রিভলবারটা পাওয়া গিয়েছে সেটা তুলে পরীক্ষা করে দেখলে সন্তর্পণে পকেট থেকে রুমাল বের করে সেটার সাহায্যে। পাঁচটা চেম্বারে তখনো গুলি ভর্তি। একটি মাত্র গুলিই ছোড়া হয়েছে। রিভলবারের বাঁটে N. G. ইংরাজী অক্ষর দুটি খোদাই করা। রিভলবারটা পরীক্ষান্তে সন্তর্পণে একপাশে টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে সুব্রত দ্বিতীয়বার তাকালো নির্মল চৌধুরীর দিকে।

বয়স ছাব্বিশ সাতাশের বেশী হবে না। বলিষ্ঠ দোহারা দেহের গঠন। গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল-শ্যাম। মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল। দাড়ি গোঁফ নিখুঁত ভাবে কামান। প্রশস্ত বুদ্ধিদীপ্ত ললাট। তীক্ষ্ম নাসা, দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠ ও ধারালো চিবুক। নির্মল চৌধুরীর পূর্বের চেহারার কোন অদলবদল হয়নি মনে হলো সুব্রতর।

নির্মলবাবু!

সুব্রতর ডাকে নির্মল চৌধুরী এবারে মুখ তুলে তাকালো।

আমাকে চিনতে পারছেন?

সুব্রতর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে নিঃশব্দে মাথা নাড়লো ভদ্রলোক।

চিনতে পারছেন না!

না।

আমার নাম সুব্রত রায়। মিঃ ঘোষ, মানে আপনার মনিবের অফিস সংক্রান্ত একটা কেসের ব্যাপারে কয়েক দিন তাঁর অফিসে আর বাড়িতে বছর দুই আগে যাতায়াত করেছিলাম। মনে পড়ছে।

মুহূর্ত কাল কি ভেবে নির্মল বললে, হাঁ। মনে পড়েছে।

পরশু সকালে আপনি শুনেছি বাড়ী থেকে বের হয়ে যান তারপর গতকাল

রাত দশটা পর্য্যন্তও আপনি বাড়ীতে ফেরেননি। কোথায় গিয়েছিলেন ?

প্রত্যুত্তরে নির্মল চৌধুরী মাথা নিচু করলো, কোন সাড়াশব্দই আর পাওয়া গেল না।

নির্মলবাবু!

জানি না!

জানেন না ?

না।

ঐ পরশু সকাল থেকে কাল রাত পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন জানেন না!

না, কারণ পরশু সকালে খুব ভোরে এক ভদ্রলোকের ডাকাডাকিতে নিচে এসে দেখি শ্রীনাথবাবু অফিসের গাড়ি নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন, মিঃ ঘোষ নাকি কি এক জরুরী কাজের জন্য এখুনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থাতেই যেতে হবে।

তারপর ?

মাঝে মাঝে হঠাৎ অমনি করে মিঃ ঘোষ আমাকে ডেকে পাঠাতেন, তাই তাড়াতাড়ি গায়ে একটা জামা দিয়ে মাসীকে কোন কিছু না বলেই আমি সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠি।—বলতে বলতে নির্মল চৌধুরী থামল।

থামলেন কেন, বলুন তারপর ?

তারপর আর আমিই নিজে কিছু জানি না।

মানে ?

গাড়িতে উঠবার পর গাড়ি ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মাথাটার মধ্যে যেন কেমন করে উঠলো—তারপর ধীরে ধীরে কেমন যেন সর্বাঙ্গ আমার অবশ অনড় হয়ে গেল!

অবশ অনড় হয়ে গেল!

হাঁ! তারপর আর আমার কিছু মনে নেই! জ্ঞান হবার পর দেখছি এই থানায় আমি।

হুঁ। আপনি বলছেন তাহলে কেউ আপনাকে এ কয় ঘণ্টা অজ্ঞান করেই রেখেছিল।

এখন মনে হচ্ছে তাই!

কিন্তু কেউ আপনাকে অজ্ঞান করলো গাড়ির মধ্যে অথচ আপনি সেটা টের পেলেন না কিছুই ?

না তবে—

তবে কি!

গাড়ির সীটে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই এখন মনে হচ্ছে কি যেন আমার গায়ে ছুঁচের মত ফুটেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা বুঝবার আগেই ধীরে ধীরে এমন অসাড় অনড় হয়ে গেলাম যে কিছু বলবার বা করবার কোন ক্ষমতা হয়নি।

ব্যাপারটা আগাগোড়াই এখনো আমার এমন একটা দুঃস্বপ্নের মত মনে হচ্ছে যে—আবার থামলো নির্মল চৌধুরী।

মোট কথা ঐটুকু ছাড়া নির্মল চৌধুরীর জবানবন্দী থেকে আর বিশেষ কোন সংবাদই সংগ্রহ করা গেল না।

অতঃপর সুব্রত মৃতদেহ পরীক্ষা করলো। নির্মল চৌধুরীই মৃতদেহ সনাক্ত করে বলেছিল সে শ্রীনাথ কর, নরেন্দ্রনাথের অফিসের ম্যানেজার। লোকটির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। রোগাটে, দড়ির মত পাকানো চেহারা। পরিধানে কালো ট্রপিক্যাল দামী স্যুট্। পায়ে ক্রেপসোলের কালো জুতো। বুকের বাঁ দিকে তাকে গুলি করা হয়েছে। এবং সেই গুলিতেই তার মৃত্যু ঘটেছে।

পানিহাটি থানার ইনচার্জ ও সুশীল সোম দুজনাই বললেন, নির্মল চৌধুরীর আগাগোড়াই সব ধাপ্পা, মিথ্যা! আসলে সেই নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীনাথ করের হত্যাকারী! এবং সেই সন্দেহেই নির্মল চৌধুরী বিচার সাপেক্ষ হিসাবে হাজতে প্রেরিত হলো।

সুব্রতও বিশেষ কোম মতামত প্রকাশ করলো না।

কারণ ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হলেও আপাতদৃষ্টিতে ও বিচারবুদ্ধিতে সুব্রতর মন যেন কেন নির্মল চৌধুরীর সমস্ত উক্তি একেবারে সুশীল সোম ও পানিহাটির থানা ইনচার্জের মত এক কথায় নাকচ করে দিতে পারেনি। থানা অফিসারদ্বয়ের নির্মল চৌধুরীকে অপরাধী ভাববার আরও একটি জোরালো evidence স্বপক্ষে ছিল। প্রথমতঃ মৃতদেহর পাশে যে ছয় চেম্বারের ওয়েভারলী রিভলবারটি পাওয়া গিয়েছিল এবং যার বাঁটে N. G. ইংরাজী অক্ষর দু'টি খোদাই করা ছিল, প্রমানিত হয়েছিল সেটা নরেন্দ্রনাথেরই নিজস্ব আগ্নেয়াস্ত্র, এবং সেটা তার শয়ন ঘরে আলমারীর ড্রয়ারের মধ্যেই থাকতো। কাজ কর্মের ব্যাপারে নির্মল চৌধুরীর সর্বদাই সে ঘরে যাতায়াত ছিল। অতএব তার পক্ষে কোন এক সময় নরেন্দ্রনাথের অজ্ঞাতে আগ্নেয়াস্ত্রটি চুরি করা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বিমলাদেবীর জবানবন্দী থেকে জানা যায়, নির্মল চৌধুরী নরেন্দ্রনাথের হত্যার দিন সকালে ও দ্বিপ্রহরে দুইবার অন্যের অলক্ষে ঘোষ নিবাসে গিয়েছিল। যদিচ নির্মল চৌধুরী ব্যাপারটা সম্পূর্ণই অস্বীকার করেছে। তার জবানবন্দী অনুসারে সে ঐ সময়টা কোন তীব্র ঔষধের প্রভাবে নাকি অজ্ঞান হয়ে ছিল। তৃতীয়তঃ আগ্নেয়াস্ত্রটার গায়ে যে আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছে সেটা নির্মল চৌধুরীরই। চতুর্থতঃ নরেন্দ্রনাথের অফিসের কাগজপত্র ও রেকর্ড থেকে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পাওয়া গিয়েছে, কোন কারণে নির্মল চৌধুরীর পরে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত বা ডিসচার্জ করবেন বলে নাকি

নরেন্দ্রনাথ মনস্থ করেছিলেন। অফিসের রেকর্ডের কথা নির্মল চৌধুরীকে বলায় সেও সে কথা স্বীকার করেছে। বলেছে, হাঁ, কোন একটা ব্যাপারে মতদ্বৈধ হওয়ায় নরেন্দ্রনাথ তাকে ডিসচার্জ করবেন চাকরি থেকে কথাটা জানিয়ে দিয়েছিলেন কয়েকদিন আগেই। তবে ডিসচার্জ লেটার তখনো সে পাইনি। ডিসচার্জের কারণ জিজ্ঞাসা করায় নির্মল চৌধুরী বলেছে, সেটা সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কাজেই সে সম্পর্কে আর বেশী কিছু বলতে নির্মল চৌধুরী সম্মত নয়। কাজে কাজেই এর পর নির্দোষিতা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্মল চৌধুরীকে পুলিশ আইনের দিক থেকে ছেড়ে দিতে পারে না।

সুব্রত তাই সেদিন দ্বিপ্রহরে এসেছিল হাজতে নির্মল চৌধুরীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে যদি আর নতুন কিছু জানতে পারে।

কিন্তু নির্মল চৌধুরীর সেই এক কথা, যা সে আজ পর্যন্ত পুলিশের কাছে বলেছে তার বেশী আর কিছুই তার বক্তব্য নেই। সে জানেও না।

এমন সময় হাজত কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন ইন্সেপেক্টার মন্মথ সান্ন্যাল।

মিঃ চৌধুরী, আপনার সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলা দেখা করতে চান।

ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালো নির্মল সান্ন্যালের দিকে। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললে, কে, মাসীমা ?

না। আপনার মাসীমা নন ! অল্প বয়েস, বললেন তার নাম করবী ঘোষ।

কে ! করবী ! মুহূর্তের জন্য চোখের তারা দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেই পরক্ষণে ম্লান হয়ে যায়। অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বলে, তাকে যেতে বলুন !···

যেতে বলবো, দেখা করবেন না !

না !

কিন্তু তিনি যখন এসেছেন এতদূর—একবার দেখা না হয় করলেনেই নির্মল-বাবু। কথাটা এবারে বললো সুব্রত। তারপর সান্ন্যালের দিকে ফিরে তাকিয়ে নির্মলের সম্মতির কোন অপেক্ষা না রেখেই বললে, যান মিঃ সান্ন্যাল তাকে এঘরে পাঠিয়ে দিন।

সান্ন্যাল চলে গেলেন।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। সুব্রত হাত বাড়িয়ে ঘরের বিদ্যুৎবাতিটা জেবলে দিল।

মিনিট কয়েক পরেই দরজার গোড়ায় পদশব্দ শোনা গেল। নির্মল চৌধুরী নিঝুম হয়ে দু'হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে লোহার খাটটার উপরে যেমন বসেছিল তেমনিই বসে রইলো। তাকালোও না।

একুশ বাইশ বছরের একটি তরুণী ঘরে এসে নিঃশব্দে প্রবেশ করলো। দোহারা চেহারা। গায়ের রঙ রীতিমত গৌর বললেও অত্যুক্তি হয় না।

নাকটা একটু চাপা, পাতলা ওষ্ঠ। সমস্ত মুখখানি ব্যেপে একটা করুণ বিষণ্ণ ভাব থাকলেও চোখ-মুখের বুদ্ধির প্রাখর্যটা চোখে পড়ে প্রথম দৃষ্টিতেই। হাতে একগাছি করে কঙ্কণ ব্যতীত অন্য কোন অলঙ্কারই নেই। পরিধানে সাধারণ গেরুয়া রঙের শাড়ী ও সাদা চিকণের ব্লাউজ। পায়ে সাধারণ একটি চপ্পল।

সুব্রত ধীরে ধীরে ঐসময় ঘর থেকে বের হয়ে গেল। কিন্তু বের হয়ে গেলেও দূরে গেল না। দরজার পাশেই নিঃশব্দে নিজেকে আড়াল করে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলো।

করবী দেখছিল নির্নিমেষে তার সম্মুখেই খাটের উপরে উপবিষ্ট নির্মল চৌধুরীকে।

একি চেহারা হয়েছে নির্মলের এই কয়দিনেই!

মাত্র সাতদিন আগেও তো দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে!

করবীর চোখের কোল দুটি আপনা থেকেই যেন ছল ছল করে ওঠে অবাধ্য অশ্রুতে। মৃদু—অতি মৃদু কণ্ঠে ডাকে, নির্মল!

নির্মল সাড়া দেয় না, মুখও তোলে না।

করবী আর একটু কাছে এগিয়ে এসে আবার ডাকে, নির্মল!

তবু সাড়া নেই।

কথাও বলবে না আমার সঙ্গে নির্মল?

রক্তের মত লাল চোখের দৃষ্টি তুলে এবারে তাকালো নির্মল করবীর দিকে।

কি দেখতে এসেছো রুবি, খুনী আসামী নির্মল চৌধুরীকে!

নির্মল! আর্ত অস্ফুট একটা চিৎকার যেন বের হয়ে আসে করবীর কণ্ঠ থেকে।

হ্যাঁ, সবাই যখন আজ আমার দিকে আঙ্গুল তুলে বলছে, আমি খুনী মিঃ ঘোষ ও শ্রীনাথবাবুর হত্যাকারী, তখন তুমিই বা বাদ যাবে কেন!

চুপ করো, চুপ করো!

চুপ করবোই বা কেন! সবাই যদি আজ আমাকে খুনী বলে বিশ্বাস করতে পারে তুমিই বা পারবে না কেন!

না, তবু আমি বিশ্বাস করবো না।

তবু বিশ্বাস করবে না! কিন্তু কতদিন তোমার এ মনের জোর রাখতে পারবে রুবি! একদিন তোমাকেও বিশ্বাস হারাতে হবে।

তুমি চুপ করবে, না এখান থেকে চলে যাবো?

চলে তো যাবেই। খুনী আসামী—

নির্মল! আর্ত অস্ফুট কণ্ঠে করবী নির্মল চৌধুরীকে বাধা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু নির্মল চৌধুরী যেন শুনেও শোনে না। বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ—যাও

যাও, এখানে আর থেকো না। তোমার বাবা যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন যে, হাজতে তুমি একজন খুনী আসামীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছো, তিনিও তোমাকে ক্ষমা করবেন না। যাও—

চোখে জল এসে গিয়েছিল করবীর। অতি কষ্টে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে এবারে, আমি তোমার কি করেছি, যে আজ সেই থেকে কেবলই তুমি আমাকে এখানে আসা অবধি আঘাতই করছো।

আঘাত! না রুবি, আঘাত তোমাকে আমি করিনি, পাছে আমার আজকের এ কলঙ্ক তোমাকে—তোমার পরিচয়কে মলিন করে ফেলে শুধু সেই—সেইজন্যেই—

কিন্তু তা নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি আজ এমনি করে ভেঙ্গে পড়েছো যে—

ভেঙ্গে পড়েছি!

হ্যাঁ, পড়েছো। কিন্তু এমনি করে যদি সামান্য একটা মিথ্যা দুর্নামের ভয়ে ভেঙে পড়ো—

জানিনা ভেঙে পড়েছি কিনা। কিন্তু তোমাকে বোঝাতে পারবো না, আর তুমি বুঝবেও না আজকের আমার এ অবস্থা! যদি বুঝতে—তারপর একটু থেমে আবার নির্মল বলে, যাক্—কিন্তু এখানে আর তুমি থেকো না রুবি। যাও, এখান থেকে যাও।

এমন সময় একজন জেল অফিসার দ্বারের ওপাশে এসে দাঁড়াল। করবীর দিকে চেয়ে মৃদু কণ্ঠে বললে, সময় হয়ে গেছে করবীদেবী।

হ্যাঁ চলুন। আমি তাহলে যাই নির্মল?

নির্মল কোন জবাব দিল না করবীর কথায়, এমন কি চোখ তুলে তাকালও না। করবী একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে মন্থর পদে ঘর থেকে বের হয়ে গেল কোনমতে উদগত অশ্রুকে চাপতে চাপতে।

॥ পাঁচ ॥

বরাহনগরের বাজার ছাড়িয়ে বাঁয়ে যে রাস্তাটা গঙ্গার ধার বরাবর চলে গিয়েছে, বলতে গেলে সেই রাস্তারই গায়ে গঙ্গার একেবারে কোল ঘেঁষে পুরোনো দিনের সাবেকী প্যাটার্ণের একটা দোতালা বাড়ী। বাড়ীটার দুটি অংশ। সামনে একটি অংশ তারপর একটি বাঁধানো উঠান তারপর আর একটি অংশ পশ্চাৎভাগে।

সামনের অংশটায় ছোটবড় খান আষ্টেক ঘর। সেই ঘরগুলোর মধ্যে এসে ভিড় করেছে নানা ভাষাভাষী নানা জাতের জন পনের-ষোল পুরুষ ও নারী নানা বয়েসের। তাদের মধ্যে দু একজন স্বামী-স্ত্রীও আছে। কেউ এপারের

তেলকলে বা পাটকলে কুলী কামিনের কাজ করে, কারো বাজারে ছোটখাটো ব্যবসাও আছে। আবার সম্পূর্ণ বেকারও দু'চারজন যে না আছে তা নয় ঐ দলের মধ্যে।

ভিতরের অংশে একতলা ও দোতালায় খান সাতেক ঘর। একতলায় দুখানা ঘর ও উপরের দক্ষিণ প্রান্তের ছোট ঘরটা ভাড়া নিয়েছেন অনিমেষ হালদার নামে এক মধ্যবয়েসী ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের চেহারাটা রোগাটে ঢ্যাঙ্গা। ডান পাটা তদ্রলোকের ডিফেকটিভ, চলার সময় দেখা যায় ডান পাটা সামান্য টেনে টেনে চলেছেন। মাথার চুল কদমছাঁট করা। মুখ ভর্তি বসন্তের কুৎসিত ক্ষতচিহ্ন। একটা চোখ কানা বলে সর্বদা চোখে একটা নীল কাচের চশমা ব্যবহার করে থাকেন। উপরের তলায় যে ঘরটিতে ভদ্রলোক বাস করেন ও নীচের তলায় যে দুটি ঘর ভাড়া নিয়েছেন তিনটি ঘরেরই আসবাবপত্র ও সাজসজ্জা দেখলেই বোঝা যায় ভদ্রলোকের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল।

তাঁর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাটা করবীদের সঙ্গে। কারণ ঐ অংশেরই একতলার একখানি ঘর ও দোতালার দুখানি ঘর নিয়ে থাকেন করবীর বাবা রমেনবাবু ও তাঁর একমাত্র মেয়ে করবী। রমেনবাবু কলকাতার একটা মার্চেন্ট অফিসে সামান্য মাইনের কেরাণী। করবী নিজেও বি-এ পাশ করে দক্ষিণেশ্বরের এক স্কুলে টিচারি করে।

অনিমেষ হালদার ঐ বাড়ীতে থাকলেও মাসে অন্তত দু'চারবার পাঁচ ছয় দিনের জন্য কোথায় যে যান তিনিই জানেন। এবং তিনি কি কাজ করেন ও তাঁর অর্থাগমের পথটা যে কি তা করবীর জানা নেই। ঐ বাড়ীতে করবীরা বছর খানেক হবে মাত্র এসেছে। তার আগে কলকাতাতেই ছিল। করবী যতদূর জানে ঐ বাড়ীর সমস্ত অংশটাই অনিমেষবাবুরই ভাড়া নেওয়া ছিল, তিনিই রমেনবাবুকে সাবলেট্ করেছেন তিনখানা ঘর। কিন্তু কি সূত্রে যে এবং কখন যে রমেনবাবুর সঙ্গে অনিমেষবাবুর পরিচয় ঘটেছিল করবী তা জানেনা বা বাবাকেও সে সম্পর্কে কখনো কোন জিজ্ঞাসাবাদ করেনি।

করবীদের সংসারে সে, তার বাবা রমেনবাবু এবং ভৃত্য ও রাঁধুনী কম-বাইন্ডহ্যান্ড অনেকদিনের পুরানো লোক রাজেন্দ্র। এক বাড়ীতে দীর্ঘ এক বৎসর থাকার দরুণ অনিমেষ হালদারের সঙ্গে করবীর যথেষ্ট পরিচয় ছিল। কিন্তু সেটা ঐ পরিচয়ই, তার বেশী কিছু নয়। কারণ করবীর মতো অনিমেষ হালদার লোকটিও স্বল্পবাক এবং একান্তভাবেই নির্জনতা-প্রিয়। কারো সঙ্গেই তিনি বড় একটা মেলামেশা করেন না। বাড়ীতে যে সময়টা থাকেন তাঁর নিজের ঘরেই থাকেন দোতালায় ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে।

ক্লান্ত শরীর ও বিষণ্ন মন নিয়ে করবী বরাহনগরের বাড়ীতে সেদিন যখন ফিরে এলো রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে আটটা হবে। বাড়ীর মধ্যের উঠানের পাশ দিয়ে

সরু প্যাসেজটা পার হয়ে দোতালায় উঠবার সিঁড়িটার আধাআধি আসতেই ওর কানে এলো বেহালার সুর। এ-বাড়ীতে বেহালার সুর যে কোথা থেকে আসছে তা করবীর অজ্ঞানা নয়। নিজের ঘরে নির্জনে বসে অনিমেষবাবুই বেহালা বাজাচ্ছেন। গত তিনদিন অনিমেষবাবুই ছিলেন না। বেহালার সুর শুনে বুঝতে পারে করবী তিনি ফিরেছেন। কি জানি কি ভেবে করবী সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠে বারান্দাটা অতিক্রম করে সোজা একেবারে বারান্দার শেষ প্রান্তে অনিমেষের ঘরের ভেজানো দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো।

বেহালার সুরটা এখন আরো স্পষ্ট শোনা যায়। মুহূর্তকাল ভেজানো দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে করবী কি যেন ভাবলো, তারপর ভেজানো দরজার কবাটের গায়ে মৃদু টোকা দিল পর পর দুটি।

সঙ্গে সঙ্গে বেহালার সুর থেমে গেল। ভিতর থেকে পুরুষ-কণ্ঠে সাড়া এলো, কে?

মৃদু কণ্ঠে করবী জবাব দেয়, আমি।

আসুন, ভিতরে আসুন করবীদেবী।

ঈষৎ ঠেলা দিতেই ভেজানো দরজার কবাট দুটো খুলে গেল আর নাকে এসে ঝাপটা দিলে রজনীগন্ধার এক ঝলক মিষ্টি গন্ধ। নিঃশব্দ পায়ে করবী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো। অত্যন্ত মৃদু অস্পষ্ট একটা নীল সেডে ঢাকা কম শক্তির বিদ্যুৎবাতির আলোয় ঘরটা যেন থম থম করছে। ঘরের মধ্যে সব কিছু দেখা গেলেও খুব স্পষ্ট দেখা যায় না।

গঙ্গার দিককার খোলা জানালাটার সামনে বেহালা হাতে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন অনিমেষ। ওর পদশব্দে ফিরে দাঁড়িয়ে হাতের বেহালাটা পাশের টেবিলের একপাশে নিঃশব্দে নামিয়ে রাখলেন।

ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র সামান্য হলেও তার সবকিছুর মধ্যে একটা সুশৃংখল পরিচ্ছন্ন রুচিবোধের ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় আছে। এক পাশে একটি সিংগিল খাট, শয্যাটি একটি দামী সবুজ বেডকভারে ঢাকা, তার পাশে একটি কাচের বুক সেলফ। সেলফের উপরে একটি ধ্যানস্থ বুদ্ধ মূর্তি। তার পাশে চমৎকার একটি গোল কাচের ভাসে এক থোকা সদ্য প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধা। ঘরের অন্যদিকে একটি স্টিলের মাঝারী আকারের আলমারি, তার পাশে একটি রাইটিং টেবিল ও রিভলভিং চেয়ার। ঘরের মাঝামাঝি ছোট একটি গোল টেবিল ও দুখানি চেয়ার। একটি আরাম চেয়ার অন্যটি সাধারণ স্টিলের চেয়ার। এক পাশে কাঠের স্ট্যাণ্ডে জলের কুঁজো। পাশে একটি কাচের গ্লাস। ঘরের মেঝেতে অত্যন্ত দামি পুরু ইজিপসিয়ান কার্পেট বিছানো। ঘরের দেওয়ালে একটি দেওয়ালপঞ্জী ও একটি বড় আর্শী। সিলিং থেকে ঝুলছে একটি ঘূর্ণায়মান বৈদ্যুতিক পাখা ও একটি কমশক্তির নীল ডোমে ঢাকা আলো। ঘরের তিনটি জানালা খোলা থাকলেও তাতে

দামী পুরু নীল সার্টিনের পর্দা টাঙ্গানো।

বসুন করবীদেবী, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

ক্লান্ত করবী নিঃশব্দে আরাম কেদারাটার উপরেই বসে পড়লো। অনিমেষ জানালার ধারে যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন তেমনিই দাঁড়িয়ে রইলেন। সেই স্বল্প আলোর মধ্যেই ক্ষণকাল তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে করবীর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে অনিমেষ কথা বললেন, কি হয়েছে করবীদেবী ?

অনিমেষের প্রশ্নে সহসা যেন চমকে ওঠে করবী। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলে, না, কিছুতো হয়নি।

হয়নি। মৃদু হাসলেন অনিমেষ। তারপর আবার বললেন, আপনার মুখ দেখে কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।

করবী চুপ। কোন জবাব দেয় না।

অবিশ্যি যা আপনার একান্ত নিজস্ব আমাকে তা বলবেনই বা কেন ? কিন্তু পরস্পরের মধ্যে যে আমাদের একটা বন্ধুত্বের দাবী আছে, সে দাবীতেও কি আমি জিজ্ঞাসা করতে পারিনা কথাটা করবীদেবী ? হয়ত আপনার কোন সাহায্যেও—

না, না—সেকি! ওকথা বলবেন না অনিমেষবাবু।··· তারপর আবার একটু থেমে বলে, আমি, মানে—

বলুন, থামলেন কেন ?

পরশুর সংবাদপত্রে বিশেষ একটা সংবাদ পড়েছেন কিনা জানিনা—

কোন্ বিশেষ সংবাদটির কথা বলছেন বলুন তো।

আমি বলছিলাম বি. টি. রোডে শ্রীনাথ করের হত্যার ব্যাপারটা—

অনিমেষ চকিতে মনে মনে কি যেন ভাবলেন, তারপর তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আবার করবীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, নির্মল চৌধুরীর সঙ্গে বুঝি আপনার পরিচয় আছে করবীদেবী ?

করবী মাথা নিচু করে, কোন জবাব দেয় না। অতঃপর কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকে। ঘরের মধ্যে যেন একটা পাষাণভার স্তব্ধতা। খোলা জানালাপথে গঙ্গাবক্ষ থেকে একটা ষ্টিম লঞ্চের হুইস্‌ল ভেসে এলো।

অনিমেষই আবার কথা বললেন, করবীদেবী।

বলুন।

নির্মল চৌধুরীর সঙ্গে আপনার অনেকদিনের পরিচয়, না ?

হাঁ,—আমরা—

বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আপনার বাবা, মানে রমেনবাবু—

কি ?

বলছিলাম একথা জানেন ?

না। ভেবেছিলাম এবারে সব বলবো, কিন্তু—

আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনার কি মনে হয় করবীদেবী, নির্মলবাবু সত্যিই নিরপরাধ ?

আপনি নির্মলকে জানেন না অনিমেষবাবু, এ সংসারে এতটুকু অন্যায় করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। সামান্য একটা কীটকে পর্যন্ত সে মারতে পারেনা। তা—

কিন্তু রিভলভারটার কথা ভুলবেন না। তাছাড়া নরেন্দ্রনাথের হত্যার ব্যাপারে পুলিশ তার বিপক্ষে যে সব এভিডেন্স সংগ্রহ করেছে—

বিশ্বাস করিনা আমি, সব মিথ্যা—একটা ষড়যন্ত্র—

তাঁর অফিসে কোন কর্মচারীর সঙ্গে কোনরকম মনোমালিন্য বা শত্রুতা ছিল বলে আপনি জানেন ?

না, সেরকম কখনো কিছু শুনেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু এখন আমি কি করি বলতে পারেন অনিমেষবাবু ? নির্মল আজ আমার সহানুভূতিটুকুকে পর্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখছে। আমার সঙ্গে ভাল করে কথা পর্যন্ত বললো না সে।—শেষের দিকে করবীর কণ্ঠস্বর অশ্রুতে জড়িয়ে গেল।

এমনিই হয় করবীদেবী, মনের যেখানে নিবীড় সম্পর্ক সেখানে মন সামান্য অপমানটুকুও সহ্য করতে পারেনা। কিন্তু কোথায় তার সঙ্গে আপনার দেখা হলো ?

হাজতে।

সেকি, আপনি সেখানে গিয়েছিলেন !

আপনি বুঝতে পারবেন না অনিমেষবাবু, আমি—

বুঝেছি। কিন্তু সত্যিই মনে হচ্ছে আপনি আজ খুব ক্লান্ত। যান বিশ্রাম করুনগে—

করবী অতঃপর চেয়ার থেকে উঠে নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। অনিমেষ ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। করবী নির্মলকে ভালবাসে। নির্মল তুমি ভাগ্যবান! এক সময় পায়চারি থামিয়ে ধীরে ধীরে অনিমেষ আবার টেবিলের ওপর থেকে বেহালাটা তুলে নিয়ে তার বুকে ছড় টানলেন। সে রাত্রে করবী ঘুমোতে পারেনি। এবং নিদ্রাহীন রাত্রির মধ্যপ্রহর পর্যন্ত সে বেহালার সুর শুনতে পেয়েছিল।

॥ ছয় ॥

নির্মল চৌধুরীর সঙ্গে করবীর সমস্ত কথোপকথনই সুব্রতর কানে এসেছিল এবং বিকালের দিকে একবার টালীগঞ্জ থানায় ঘুরে কিরীটির ওখানে যখন এলো তখনও সেই কথাগুলোই তার মনের মধ্যে আনাগোনা করছে।

কিরীটি একটা ক্রসওয়ার্ড পাজল্ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সুব্রতর পদশব্দে কাগজ থেকে চোখ না তুলেই সুব্রতকে সম্বোধন করে বললো, বল, ওয়ান হুঁ লাভ্স সিক্রেটলি। কি হবে?

সুব্রত পাশেই একটা সোফার পরে বসতে বসতে ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, পুরুষ না নারী?

যদি বলি নারী?—বলতে বলতে কিরীটি ফিরে তাকালো স্মিতভাবে সুব্রতর মুখের দিকে।

তবে উইডো হবে।—সুব্রত জবাব দেয়।

হুঁ। তা তোর উইডোর সংবাদ কি?—কথাটা বলে কিরীটি আবার হাতের কাগজে মনোনিবেশ করে?

আমার উইডো! সে আবার কি?

আরে তোর মানে কি তোর নিজের। হুঁ! কোন কুমারীর সঙ্গেই আজ পর্যন্ত একটা প্রেম করতে পারলি না, তুই করবি উইডোর সঙ্গে প্রেম! বলছিলাম তোর বিমলাদেবীর কথা।—বলতে বলতে কিরীটি এবার সোজা হয়ে বসে। পাশেই ত্রিপয়ের পরে রক্ষিত এ্যাসট্রের উপর থেকে নির্বাপিত অর্ধদগ্ধ সিগারেট তুলে নিয়ে আবার তাতে অগ্নিসংযোগে মনোনিবেশ করে।

বিমলাদেবী?

হুঁ। খোঁজ নিসনি, ঐ তো তোর দোষ সুব্রত। আরে এটা বুঝিস না কেন, যেখানেই নিষিদ্ধ প্রেম সেখানেই গণ্ডগোল। যাক—নরেন্দ্রভ্রাতা বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে একবার দেখা করেছিলি?

না।

তা করবি কেন, সেখানে গেলে হয়তো দু'চারটে ইম্পর্টেন্টক্লু পেয়ে গেলেও পেতিস। তাছাড়া সেখানে শ্রীমতী বেবী ঘোষের—আধুনিক সোসাইটির সো কল্ড অগ্নিস্ফুলিঙ্গটির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হতো—

তুই চিনিস নাকি বেবী ঘোষকে?

সাক্ষাৎ পরিচয়ের আজো সৌভাগ্য হয়নি বটে তবে স্বনামধন্যা তো, দু'চারবার অভিজাত সোসাইটির ফাংশনে কর্তৃত্ব করতে দেখেছি দূর থেকে। যাক্ সেই ফিল্ম স্পুলের শেষাংশর কাগজটুকু যে এ্যানালিসিস্ করে দেখতে বলেছিলাম। রথীনের কাছে ল্যাবরেটরীতে পাঠিয়েছিলি?

হ্যাঁ, সে কাগজে নাকি পটাশিয়াম সায়ানাইড মাখানো ছিল।

যা আশা করেছিলাম তাহলে তাই। পটাশিয়াম সায়ানাইড তাহলে সেই ফিল্ম স্পুলের উপরের ব্ল্যাক কাগজটার গায়ে মাখিয়েই হত্যাকারী তার কাজ সুসম্পন্ন করেছে। উঃ, লোকটা ক্রিমিন্যাল হলে কি হবে, ব্রেন আছে। চমৎকার উপায়ে মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করেছে। বেচারা নরেন্দ্রনাথ সমস্ত ফিল্মটা এক্সপোজ্ করে, ডেভালাপের জন্য রোল করে নিঃসংশয় চিত্তে যেমন জিভের

লালা দিয়ে রোলটা আঁটবার পূর্বে ভিজাতে গিয়েছেন, সাক্ষাৎ মৃত্যুবিষ তাকে শেষ চুম্বনে একেবারে মুহূর্তে লোকান্তরিত করে দিয়েছে। তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এবারে তোমার হত্যাকারী অর্থাৎ তোমার প্রতিপক্ষটি কি চিজ্ !

তাতো বুঝতেই পারছি। কিন্তু—এক্ষেত্রে তাহলে কে নরেন্দ্রনাথের হত্যাকারী হতে পারে ?

নরেন্দ্রনাথের হত্যাকারী যিনিই হোন, একটা কথা হত্যাকারী সম্পর্কে এখুনি তোমাকে নিশ্চয়ই করে বলতে পারি সুব্রত—যেটা সেদিন আমার মনে সামান্য সন্দেহের ছায়া ফেলেছিল মাত্র। মহাশয় ব্যক্তিটি হত্যার সময়ে ধারে কাছে একেবারেত ছিলেনই না বরং নরেন্দ্রনাথের নিকট হতে বেশ দূরত্ব রেখেই হাসতে হাসতে নিশ্চিন্ত মনে অতীব কৌশলে পটাশিয়াম সায়ানাইড নামক অব্যর্থ ও অমোঘ মৃত্যুবাণটি সেই ফিল্মরোলের মধ্যেই পুরে প্রেরণ করেছিলেন।

তাহলে বিমলাদেবী ?

তিনিই হয়ত খুব সম্ভবত কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

চকিতে একটা সম্ভাবনা সুব্রতর মনের মধ্যে উঁকি দেয়। সে তাড়াতাড়ি বলে, তবে কি—

কিন্তু তার ভাবাবেগে বাধা দিল সঙ্গে সঙ্গে কিরীটি। বললে, নো, নট্ সো ফাস্ট—অত দ্রুত নয়। কনক্লুশনে জাম্প করার আগে নিজের যুক্তিতে আগে নিঃসন্দেহ হতে হবে।

আচ্ছা নির্মল চৌধুরী সম্পর্কে তোর কি মনে হয় কিরীটি।

নিঃসন্দেহে এ নাটকের অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্র তিনিই। অবহেলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া কর্তব্য নয়। দেখ না, কয়েকদিনের মধ্যেই তো তার মামলা আদালতে শুরু হবে। সে সময় উভয় পক্ষের উকিলের সওয়ালে অনেক কথাই হয়ত আরো, জানতে পারবি।

আজ তার সঙ্গে আবার হাজতে দেখা করতে গিয়েছিলাম।—সুব্রত বলে।

নতুন কিছু জানতে পারলি ?

না।—বলে সংক্ষেপে ঐ দিনকার দ্বিপ্রহরের সমস্ত কাহিনী সুব্রত কিরীটিকে শুনিয়ে দিল।

কিরীটি সব শুনে বললে, হুঁ, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে সেই চিরাচরিত ত্রিভুজ কাহিনী। নির্মল, করবী ও বিমলাদেবী।

কিরীটি বলেছিল সুব্রতকে বিনয়েন্দ্র ও তার ভাইঝি শ্রীমতী বেবীর সঙ্গে গিয়ে আলাপ করে আসবার জন্য ; কিন্তু বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে না হলেও দিন দুই বাদে একান্ত আকস্মিকভাবেই অদ্ভুত এক পরিস্থিতির মধ্যে শ্রীমতী বেবীর সঙ্গে সুব্রতর সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়ে গেল। পাটনায় এক বন্ধুর বিয়ে একরাত্রির

জন্য হলেও যেতেই হবে সুব্রতকে। কাজের চাপের দোহাই দেখিয়েও সুব্রত রেহাই পায়নি। তাই সে শেষ পর্যন্ত বন্ধুকে বলেছিল জরুরী একটা কাজে বিয়ের আগের দিন সে বর্ধমানে যাচ্ছে সেখান থেকেই সে দিল্লী এক্সপ্রেস ধরে পরের দিন সকালে পাটনায় গিয়ে নিশ্চয়ই পেঁছাবে। এবং বলা বাহুল্য যে রাত্রে পাটনা যাত্রী সুব্রতর বর্ধমান থেকে দিল্লী এক্সপ্রেস ধরবার কথা, সেই রাত্রেই দিল্লী এক্সপ্রেসে বেবী চলেছিল একটা ফার্স্টক্লাশ কুপে রিজার্ভ করে, লেডিজ কম্পার্টমেণ্টে কনভার্ট করে দিল্লীতে কোন এক নারী সঙ্ঘের মিটিংয়ে যোগ দিতে।

রাত প্রায় সাড়ে এগারটা দিল্লী এক্সপ্রেস এসে দাঁড়ালো বর্ধমানে। রাত্রে চলন্ত ট্রেনে বেবী কোনদিনই ঘুমোতে পারেনা বলে সাধারণত ঐ ধরনের জার্নির সময় বেবী একগাদা পেঙ্গুইন সিরিজের ক্রাইম ফিক্‌সন নিয়ে যেতো। বেবীর বয়স তেইশ চব্বিশের বেশী হবে না। ঘোষেদের পিতৃদেবের জীবিত-বস্থায় যখন একান্নবর্তী পরিবার ছিল সেই সময় থেকেই বাড়ীর মধ্যে ঐ একটিমাত্র মেয়ে হওয়ায় চিরদিন একটু বেশী আদরই পেয়ে এসেছে। এবং অল্পবয়সে মা মারা যাওয়ায় বেবীর বাবা অমরেন্দ্রনাথ সর্বদা মেয়েকে একটু বেশী আদর ও প্রশ্রয়ই দিয়ে এসেছেন বরাবর। ছোটকাকা বিনয়েন্দ্রনাথও বেবীকে বরাবরই একটু বেশী স্নেহ করতেন। সকলের স্নেহ ও প্রশ্রয়ের মধ্যে মানুষ হওয়ায় বেবী হয়ে উঠেছিল বিশেষ রকম খেয়ালী ও চঞ্চল।

ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর পৃথক হয়ে কাকার ওখানে এসে ওঠায় এবং কোন ব্যাপারেই কাকা বিনয়েন্দ্র তাকে কোনরূপ বাধা না দেওয়ায় তার সেই চঞ্চল ও খেয়ালী স্বভাবটা যেন আরো বেশী প্রকট হয়ে উঠেছিল। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, রোগাটে চেহারা। মাথায় একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, জোড়া ভ্রূ—টানাটানা দুটি চোখ, অদ্ভুত একটা শ্রী যেন ছিল চোখে মুখে। তার উপরে বুদ্ধির দীপ্তিতে যেন আরো সজীব মনে হতো।

কলকাতা শহরে শ্রীমতী বেবীকে চিনতো না এমন খুব কম লোকই ছিল এবং সর্বত্র তার আসল নামটা চাপা পড়ে গিয়ে তাঁর বাপের আদরের প্রিয় বেবী নামটিতেই সে পরিচিত হয়ে উঠে ছিল। ছাত্রী সঙ্ঘের সে নেত্রী, এক্‌জিবিসন, জলসা, থিয়েটার, নৃত্যনাট্য সর্বপ্রকার কৃষ্টির ব্যাপারে সেই ছিল অন্যতমা প্রধানা উদ্যোক্তা।

লোয়ার বার্থে বালিশের উপর হেলান দিয়ে আধশোয়া ও আধবসা অবস্থায় বেবী গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটা ক্রাইম ফিক্‌সন পড়ছিল। এক সময় গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা পড়লো, গার্ডের হুইস্‌লের শব্দ শোনা গেল, ও গাড়ি মন্থর গতিতে চলতে শুরু করল। এবং গাড়ি প্ল্যাটফরম ছাড়বার আগেই সহসা চলমান গাড়ির বন্ধ দরজার হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে দরজা ঠেলে খুলে একটা সুটকেশ হাতে সুব্রত এসে হাঁপাতে হাঁপাতে কম্পার্টমেণ্টে ঢুকে পড়লো,

কিন্তু কামরার মধ্যে একাকিনী তরুণী বেবীকে জেগে থাকতে দেখে একটু যেন বিব্রত হয়েই বিনীত নম্র স্বরে বললে, এক্সকিউজ মি, মানে—

বেবীর মনেই ছিল না যে ক্ষণপূর্বে বর্ধমানে একজন লেডি টি. টি. উঠেছিল তার কুপেতে টিকিট চেক করবার জন্য। এবং সে নেমে যাবার পর অসাবধানতা বশতঃ সে দরজায় লক্ করতে ভুলে গিয়েছিল।

কিন্তু ততক্ষণে বেবী বার্থের উপরে বইটা হাতে করে ধড়ফড় করে সোজা হয়ে উঠে বসেছে। এবং তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে আগন্তুক সুব্রতর দিকে তাকিয়ে রুক্ষ কণ্ঠে বলে, হোয়াট্‌স দি আইডিয়া। কে আপনি? জানেন এটা লেডিজ রিজার্ভড ফার্স্টক্লাশ।

বিশ্বাস করুন, তাড়াহুড়ায় এবং সমস্ত ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাশ কামরার দরজার ভিতর থেকে লক্-আপ করা থাকায় এ গাড়িতে উঠে পড়েছি। লেডিজ বা রিজার্ভড দেখবার মত সত্যিই আমার সময় ছিল না।

সময় ছিল না মানে কি! ডু ইউ মিন টু সে ইউ আর ব্লাইণ্ড—অন্ধ বলতে চান?—রাগত কণ্ঠে বেবী আবার প্রশ্ন করে।

না অন্ধ হবো কেন! তাড়াতাড়িতে—

যান এখুনি নেমে যান এ কামরা থেকে!

কি বলছেন আপনি। এই চলন্ত গাড়ি থেকে! জানেন কত স্পীডে ট্রেনটা এখন ছুটছে, চল্লিশ মাইলের কম নয় ঘণ্টায়। আর উঠে যখন পড়েছিই—

কোন কথা আপনার আমি শুনতে চাইনা। নেমে যাবেন কিনা বলুন?

দেখুন, বিশ্বাস করুন, আমি চোর ডাকাত নই আর আমার নামে দুর্নাম যারা রটাতে পারে তারাও দুশ্চরিত্রের অপবাদ আমাকে দিতে পারবেন না। মিথ্যে আপনি অধীর হচ্ছেন। আমি বসতেও চাইনা—

কি বললেন? বসবেন?

না, বলছিলাম দাঁড়িয়ে আছি, বাকী পথটুকু আসানসোল পর্যন্ত দাঁড়িয়েই থাকবো, তারপর ট্রেন স্টেশনে থামলেই নেমে যাবো!

বেবী এবারে সোজা হাত বাড়িয়ে এলার্ম সিগন্যালের চেনটা ধরবার চেষ্টা করতেই সুব্রত বাধা দিয়ে বলে ওঠে, আরে—করেন কি! আপনি তো দেখছি সাংঘাতিক চঞ্চলমতী।

কি বললেন?

বলছিলাম, কেন মিথ্যে পঞ্চাশটা টাকা জরিমানা দেবেন।

পঞ্চাশ টাকা কেন হাজার টাকা জরিমানাও যদি দিতে হয় তবু আপনাকে আমি ধরিয়ে দেবো। ভাবছেন আপনার মতলবটা আমি এখনো বুঝতে পারিনি, উইদাউট টিকেটে জার্নি করবার মজাটা এখুনি টের পাবেন।

বাঃ চমৎকার উর্বর দেখছি আপনার চিন্তাশক্তি। শেষ পর্যন্ত বুঝে নিলেন ডব্লিউ-টি। কথাটা বলতেই হঠাৎ সুব্রতর মাথার মধ্যে একটা দুষ্টুবুদ্ধি

এসে উঁকি দেয়। তার সহযাত্রিনীকে নিয়ে খানিকটা মজা করবার লোভ সামলাতে পারে না। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে, দেখুন এটা কিন্তু সত্যিই আপনি আমার পরে অবিচার করছেন—একটিবার দয়া করে ভেবে দেখুন—

যথেষ্ট ভেবেছি।

না, আপনি একটুও ভাবেননি। গাড়িতে ওঠা অবধিই তো কেবল ঝগড়াই করছেন, ভাববার সময় পেলেন কখন।—কথার সঙ্গে সঙ্গে সুব্রতর ওষ্ঠপ্রান্তে একটা চাপা হাসি যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে। এবং দুর্ভাগ্য সুব্রতর সেই চাপা হাসিটুকু বেবীর দৃষ্টি এড়ায় না।

ক্রুদ্ধ চাপা কণ্ঠে বেবী বলে ওঠে, আবার হাসছেন। ডোণ্ট ইউ ফিল্ এ্যাশেমড্।

না, লজ্জা—লজ্জার কি আছে এতে। কিন্তু সত্যি বলছি নাহোক আপনার সঙ্গে সেই থেকে তর্ক করতে করতে গলাটা আমার শুকিয়ে উঠেছে। ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড—বলতে বলতে হুকের সঙ্গে ঝুলন্ত পেটমোটা ফ্লাস্কটার দিকে তাকিয়ে সুব্রত বলে, ওই ফ্লাস্কটায় নিশ্চয় আপনার চা আছে।

হ্যাঁ, আপনার জন্য তৈরী করে এনেছি—রাগত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয় বেবী।

তাই কি আর ভাবতে পারি।

কি বললেন ?

না, বলছিলাম, কুজো দেখছি না সঙ্গে, আপনার বুঝি জল তেষ্টা পায় না।

হঠাৎ কি ভেবে বেবী এবারে উঠে দাঁড়ালো বার্থ থেকে এবং এগিয়ে গিয়ে হুক থেকে ফ্লাস্কটা নামিয়ে এগিয়ে দিয়ে সুব্রতর দিকে বললে, নিন্—

থ্যাঙ্কস্।

এবারে আর কোন প্রত্যুত্তর না দিয়ে নিজের জায়গায় পা গুটিয়ে বসে অর্ধপঠিত ফিক্সনটা তুলে নিয়ে বইয়ের পাতায় মনোনিবেশ করলো বেবী। সুব্রত কিন্তু ফ্লাস্কটায় হাতও দেয় না। বার্থের অর্ধেকটারও বেশী খালি পড়ে আছে। পা গুটিয়ে বসে বেবী বই পড়ছে। সুব্রত দরজার একপাশে হেলান দিয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। গতির বেগে গাড়িটা যেন মন্দাক্রান্তা তালে দুলছে। একঘেয়ে চাকার ঘট ঘট ঘটাং ঘট ঘট ঘটাং শব্দটা একটানা শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ বেবী আড়চোখে একবার দণ্ডায়মান সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বললো, অমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে আপনাকে আমি বলেছি নাকি ? এবং কথাটা বলে আবার বইয়ের পাতায় মনোনিবেশ করল।

সুব্রত মৃদু হেসে হাতের সুটকেশটা এবারে একপাশে নামিয়ে রেখে বার্থের উপর বসল। গাড়ি তেমনই চলেছে। হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলো সুব্রত—রাত সোয়া বারটা। আসানসোলে পেঁছাতে এখনো কিছু দেরি আছে। দুজনাই চুপচাপ। কিন্তু এমনি করে বোবার মত চুপচাপ—বিশেষ

করে পাশেই এক তরুণী সহযাত্রিনী বসে থাকলে ট্রেন জার্নি করা যায় নাকি!
অন্তত সুব্রতর কুষ্ঠিতে তা লেখা নেই।

সুব্রতই এবারে কথা বললে, কতদূর যাচ্ছেন?

রুক্ষকণ্ঠে জবাব এলো, তাতে আপনার দরকার?

দরকার আর কি। ট্রেনজার্নির সময় সহযাত্রী হিসাবে তাঁর সহযাত্রিনীর গন্তব্য স্থানের খবরাখবরটা নেওয়াও তো একটা রেওয়াজ কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম আর কি। তা একাই যাচ্ছেন বুঝি?

হ্যাঁ, একাই আমি যেয়ে থাকি।

তাই দেখছি।

মানে?

না, তাই বলছিলাম।

কথা না বলে পিপাসা পেয়েছিল বলছিলেন, ফ্লাস্ক থেকে চা খান।

না, ধন্যবাদ।

বেবী আর একবার তেরছা ভাবে সুব্রতর দিকে তাকিয়ে নিজের হাতের বইতে মন দিল।

আবার সুব্রত কথা বললে, আপনি দেখছি এখনো আমার ওপর রেগেই আছেন।....

বেবী কোন জবাব দেয় না।

সুব্রত বেবীর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলে, তাড়াহুড়োর মাথায় স্টেশনের আলোয় ভাল করে না দেখতে পাওয়ার দরুণ একটা না হয় ভুল করেই ফেলেছি, এবং সে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে নিতেও প্রস্তুত। তা সত্বেও যদি আপনি—

এরকম ভুল আর করবেন না।

নিশ্চয়ই না। তারপর একটু থেমে বলে, মাপ করবেন, এখুনি গাড়ি স্টেশনে এসে যাবে, নেমে পড়বো। কিন্তু আমাদের এই অদ্ভুত পরিচয়ের ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত অপরিচয়ের মধ্যেই থেকে যায় সেটা কি ভাল দেখাবে। তাই বলছিলাম আমার নাম সুব্রত রায়, আপনার নামটা—

বই থেকে মুখ না তুলেই পূর্ববৎ গম্ভীর কণ্ঠে বেবী জবাব দিল, মমতা ঘোষ!

মমতা ঘোষ!

হ্যাঁ, কিন্তু সকলে আমাকে বেবী ঘোষই বলে—

হঠাৎ যেন সুব্রত চমকে ওঠে। বলে, কি বললেন?

সুব্রতর কণ্ঠস্বরে বেবীও চমকে ফিরে তাকিয়েছিল। বলে আবার, বেবী ঘোষ।

আপনি—আপনি কি?

কি আমি ?

নরেন্দ্রনাথ ঘোষ—মানে যিনি কিছুদিন আগে—

হ্যাঁ, আমার বড়কাকা ছিলেন তিনি।

আই-সি।

আপনি তাঁকে চিনতেন নাকি ?

হ্যাঁ, মানে—

ইতিমধ্যে ট্রেনের গতি যে মন্থর হয়ে এসেছে দুজনের একজনও তা টের পায়নি। ধীরে ধীরে এক্সপ্রেস আসানসোল প্ল্যাটফর্মে ইন্ করলো। যাত্রী, কুলী ও ভেণ্ডারদের চেঁচামেচি ও আলো দেখে সুব্রত উঠে দাঁড়াল। এবং হাত বাড়িয়ে সুটকেশটা তুলে নিয়ে বললে, আসানসোল, আচ্ছা তাহলে চলি মিস্ ঘোষ।

চললেন নাকি ?

হ্যাঁ—সুব্রত গাড়ির কম্পার্টমেণ্ট থেকে নেমে গেল।

॥ সাত ॥

তারপর একদিন আদালতে নরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীনাথ করের হত্যার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকার সন্দেহে ধৃত নির্মল চৌধুরীর বিচার শুরু হলো। বিমলা-দেবীর সাক্ষ্য, নির্মল চৌধুরীর পুলিশের কাছে দেয় জবানবন্দীর মধ্যে কিছু অংশ স্বেচ্ছায় গোপন করে যাওয়া, সব কিছু মিলে নির্মল চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগটা যেন রীতিমত ঘোরালো হয়ে ওঠে। এবং ফলে মামলা যে তার স্বপক্ষে যাবে না বুঝতে কারোরই কষ্ট হয় না।

ইতিমধ্যে করবী আর একদিন হাজতে গিয়ে নির্মলের সঙ্গে দেখা করেছিল। করবী বলেছিল, কেন তুমি এখনো সব কথা খুলে বলছো না।

কি খুলে বলবো, সবই তো বলেছি। আর যা বলেছি এক বর্ণও তার মধ্যে মিথ্যা নেই।

করবী প্রতিবাদ জানিয়েছিল, না, তুমি বলোনি! দুটো রাত ও একটা দিন তুমি কোথায় ছিলে ?

জানলে তো বলবো। নিজেই বুঝতে পারিনি। সামান্য কয়েক মুহূর্তের জন্য জ্ঞান ফিরে এসেছিল মাঝখানে, কিন্তু সে সময় যা দেখেছি বা শুনেছি তা যেমন অস্পষ্ট তেমনি ধোঁয়াটে। সে কথা বলতে যাওয়া শুধু বোকামীই নয়, বাতুলতা—

তবু—তবু তুমি সব বলো। অকপটে সব স্বীকার করো নির্মল।

সব মিথ্যে, কোন লাভ হবে না তাতে করে রুবি। আমাদের মত লোকেরা

চিরদিন এমনি ভাবে অপমানিত হয়, কলঙ্কের বোঝা মাথা পেতে চিরদিন নিয়ে এসেছে, আজো নিতে হবে।

না, না—ওকথা বলো না।

তুমি যদি ভেবে থাকো যে, এরা আমাকে মুক্তি দেবে তাহলে ভুল করছো। ভুল—হ্যাঁ, ভুল আমি করেছি বৈকি। অর্থের মোহে নিজের বুদ্ধিকে বিক্রি করেছি। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না। করতে হবে বৈকি। তাই আবার তোমাকে বলছি রুবি, আমাকে তুমি ভুলে যাও, নির্মল বলে কেউ কখনো তোমার জীবনে এসেছিল ভুলে যাও সে কথা। তুমি আর এখানে এসো না, যাও, যাও।

মামলা চলেছে আজ প্রায় একমাস ধরে। দীর্ঘ এই একটি মাসের প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত যে কি দুঃসহ চিন্তার মধ্যে নির্মলের গিয়েছে একমাত্র তা নির্মলই জানে। আশা নেই, আকাঙখা নেই, শুধু বুকভরা নিরাশা, বেদনা, ও লজ্জার এক মর্মান্তিক একটানা দুঃসহ পীড়ন। এই এক মাসের মধ্যেই নির্মলকে যেন আজ আর চিনবারও উপায় নেই। এক মুখ দাড়ি, গলার কণ্ঠার হাড় দুটো বিশ্রী ভাবে ঠেলে উঠেছে। চোয়ালের হাড় জেগে উঠেছে। বুকের পাঁজরাগুলো যেন প্রত্যেকটি গোনা যায়। মাথার লম্বা লম্বা চুলগুলো রুক্ষ, ধূলি-মলিন, জট পাকিয়ে গিয়েছে। দুচোখের দৃষ্টিটা কেবল যেন আরো উজ্জ্বল, আরো অন্তর্ভেদী হয়ে উঠেছে উপায়হীন অন্তর্জালার এক তীব্র অগ্নিদাহে, সমস্ত জগতের উপর এক নিষ্ঠুর বিদ্বেষ ও ঘৃণায়।

এক এক সময় নির্মলের ইচ্ছা যায় ঐ জেলের সামনের লোহার গরাদ ভেঙ্গে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানায়। কেন, কেন সে এই বিচার প্রহসনের মধ্যে কাঠের পুতুলের মত নিরুপায় দাঁড়িয়ে থাকবে। সে কি বুঝতে পারছে না এই বিচার প্রহসনের শেষ অধ্যায়ে তার জন্য কি অপেক্ষা করছে। তবে কেন এই যুক্তিহীন প্রহসনের মর্মান্তিক দুঃসহ জ্বালা বোকার মত স্বীকার করে নেবে। আবার এক এক সময় মনে হতো, একবার যদি কোনক্রমে এই পাষাণ প্রাচীরের বাইরে যেতে পারতো, এমনি করে যে তার জীবনকে চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, যেমন করে হোক তাকে বের করতোই। উঃ, আগে যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতো। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। এমনি করেই আজ তাকে হয় এ পৃথিবী থেকে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে চলে যেতে হবে, নচেৎ জীবনের বাকী কটা দিন এই কারা প্রাচীরের অন্তরালে নিঃশেষে তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয়িয়ে ফেলতে হবে।

শনিবার। সকাল থেকেই টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সমস্ত

আকাশটা একেবারে মেঘে মেঘে যেন কালো হয়ে আছে। দ্বিপ্রহরের খাদ্য এখনো তেমনই পড়ে আছে থালায়, নির্মল স্পর্শও করেনি।

গরাদের সামনে বসে নির্মল জেল প্রাঙ্গনের দিকে তাকিয়ে ছিল। জেলরক্ষী রহমান গরাদের ওপাশে এসে দাঁড়ালো এবং নির্মল কিছু বুঝে উঠবার আগেই রহমান বারেকের জন্য এদিক ওদিক তাকিয়ে চট্ করে তার নীল কোর্তার পকেট থেকে একটা খামেভরা চিঠি বের করে টুপ করে গরাদ গলিয়ে নির্মলের সামনে ফেলে দিয়েই আবার চলে গেল।

নির্মল একটু বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। তবু হাত বাড়িয়ে খামটা সে তুলে নিল। খামটা হাতে করে নির্মল সেলের একপাশে গিয়ে ভাল করে খামটার দিকে তাকালো। একটা মুখ আঁটা নীল রংয়ের খাম। উপরে কোন নাম বা কিছু লেখা নেই।

খানিকটা বিস্ময় খানিকটা কৌতূহল। খামের মুখটা ছিঁড়ে ফেলতেই অনুরূপ নীল রংয়ের একটি ছোট চৌকো চিঠির কাগজ বের হয়ে এলো। কিন্তু চিঠির বিষয়বস্তু নির্মলের এতটুকুও বোধগম্য হয় না। ইংরাজী অক্ষরে টাইপ করা চিঠির বিষয়বস্তু কিন্তু তার কোন অর্থ বা মানেই খুঁজে পায় না নির্মল। চিঠির মধ্যে যা ছিল টাইপ করা।

JE CHITHI DEACHE, TARSANGE KATHA BALOON,
JADI MUKTI CHAN, SAEE PATH BATLE DEBE,

একবার দুবার তিনবার চারবার টাইপ করা ইংরাজী অক্ষরগুলো পড়ে গেল নির্মল কিন্তু মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না। অর্থ কি! দুর্বোধ্য এই পাশাপাশি টাইপ করা ইংরাজী শব্দগুলোর কি অর্থ! নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই এর কোন অর্থ আছে। অথচ সে কিছুই বুঝে উঠ্তে পারছে না।

ধোঁয়ার মত মস্তিষ্কের কোষে কোষে চিন্তাটা নির্মলের ঘুরপাক খেয়ে ফিরতে থাকে। কখনো মনে হয় এক সারি ছোট ছোট কালো পিঁপড়ে যেন মাথার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আবার কখনো মনে হয় কতকগুলো কালো কালো ছোট ছোট বিন্দু পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করে কি যেন একটা দুর্বোধ্য শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করছে। শুধু কি সেগুলো শব্দই! কোন অর্থই নেই তার! না, এ যেন কোন একটা পরিচিত গানের সুর হঠাৎ একদিন খুব ভাল লেগেছিল অথচ এখন কিছুতেই মনে পড়ছে না সেই চেনা সুরের কথাগুলো।

একটা রাত একটা দিন তারপর কেটে গেল নির্মলের, কিন্তু চিঠির কোন রহস্যই কিনারা করতে পারলো না সে। ইতিমধ্যে রহমান আরো দু'বার ওর সামনে এসে ঘুরে গিয়েছে। ওর মুখের দিকে চেয়ে কি যেন বলতে গিয়েও না বলে সরে গিয়েছে। অথচ নির্মলেরও সাহসে কুলোয়নি রহমানকে কোন প্রশ্ন করতে।

তৃতীয় দিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে নির্মল ঐ চিঠির রহস্যের কথাই আনমনে চিন্তা করছিল। কাল আবার আদালতে তার মামলার শুনানী আছে। মাথার উপরে ঝুলন্ত কম শক্তির বিদ্যুৎবাতির চারপাশে একটা মথ্ ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে ফিরছে। হঠাৎ একটা কথা ওর মনের মধ্যে উঁকি দিল। JE CHITHI পরপর ইংরাজী অক্ষরগুলোর মানে কি! মানে 'যে চিঠি' তো নয়! সঙ্গে সঙ্গে ধড়ফড় করে উত্তেজনায় উঠে বসলো নির্মল। ইংরাজী টাইপ দিয়ে বাংলা কথাই লেখেনি তো লেখক। হ্যা, ঠিক! আশ্চর্য! আশ্চর্য! তাইতো!

"যে চিঠি দিয়েছে, তার সঙ্গে কথা বলুন, যদি মুক্তি চান সে পথ বাতলে দেবে।"

বিস্ময়ে কৌতূহলে উত্তেজনায় নির্মলের সমস্ত শরীরটা যেন কাঁপছে। ঢং করে জেলখানার পেটা ঘড়িটা রাত্রি সাড়ে এগারটা ঘোষণা করলো। পায়চারি করতে থাকে নির্মল ক্ষুদ্র সেলটার মধ্যে অস্থির অশান্ত মনে। যে চিঠি দিয়েছে, মানে রহমান। রহমানই তো তাকে চিঠি দিয়েছে।....

সত্যি সত্যিই কি ঐ চিঠি এনেছে তার বন্দী জীবনে কোন মুক্তির আশা। না সবটাই তার বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র। না গত দুই মাসের দুর্বিসহ চিন্তাক্লিষ্ট মনেরই একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। কিন্তু যদি তা না হয়, সত্যি সত্যিই যদি তার সামনে আজ এসে থাকে সুনিশ্চিৎ মুক্তির এক সম্ভাবনা। তাহলে, সে কি তাকে হেলায় হারাবে। আবার পরক্ষণেই মনে হয় মুক্তি, এই সদাসতর্ক প্রহরী বেষ্টিত কারাঘরের থেকে মুক্তি, এও কি সম্ভব! এদের চোখে ধুলো দিয়ে পালানো, সে যে শুধু অসম্ভবই নয়, অবিশ্বাস্য। পরক্ষণেই আবার মনে হয়, যে এই সাংকেতিক চিঠি তাকে প্রেরণ করেছে সে কি সব না বুঝেই দিয়েছে! আরো একটা কথা আছে, সে না হয় কোন মতে এদের সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে এখান থেকে মুক্তি পেল। তারপর! চিহ্নিত বিচারাধীন খুনী আসামী সে! বাইরে বের হলেই বা তার নিষ্কৃতি কোথায়। অনেকেই তাকে চেনে। তারপর বিরাট পুলিশ বাহিনী, তারাই কি নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবে। তবে ?—

না, না—সে আর ভাববে না এখানে থাকলেই যে সে বিচারে মুক্তি পাবে তারও তো কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং সে আশা কমই! তবে কেন সে অন্যায় অত্যাচারকে মাথা পেতে মেনে নেবে! কেন সে ভীরুর মত কলঙ্ককে স্বীকার করে নেবে। না, না—সে মুক্তির সম্ভাবনা যখন এসেছে তাকেই সে গ্রহণ করবে। মনস্থির করে ফেলে নির্মল।

রহমান, রহমান!

টিপ্ টিপ্ করে আজো সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টি পড়ছে। বাহিরে বৃষ্টিঝরা

নিকষ কালো অন্ধকার রাত্রি। চোখের দৃষ্টি যেন অন্ধ হয়ে যায়।

রহমান, রহমান—আজ একবার এই মুহূর্তে আসে না। বাইরের বারান্দায় ও কিসের শব্দ। প্রহরীর পায়ের শব্দ তো নয়। সে যে তার যথেষ্ট পরিচিত। তবু পায়ের শব্দই। শব্দটা এদিকে আসছে। মুহূর্তে নির্মলের সমস্ত শ্রবণশক্তি যেন প্রখর তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে। অধীর ব্যাকুল প্রতীক্ষায় সমস্ত দেহ যেন রোমাঞ্চিত হয় তার। কে আসছে।

সহসা ঐ সময় বাহিরে বিদ্যুতের আলোয় মুহূর্তের জন্য চারিদিক যেন ঝলসে দিয়ে গেল।

কে, কে ঐ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, রহমান না !··· হ্যাঁ রহমান।

চাপা তীক্ষ্ম কণ্ঠে ডাকে নির্মল, রহমান।

বাবু।

রহমান।

দরজার মোটা মোটা লোহার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে রহমান। ঘরের আলো খানিকটা রহমানের চোখে মুখে পড়েছে। কঠিন ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রহমান ওর মুখের দিকে।

চিঠি পড়েছি রহমান।

হিস্, আস্তে—

আমি প্রস্তুত।

ঠিক আছে, রাত দুটোয় আসবো।

বলেই রহমান আর সেখানে দাঁড়ালো না। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আড়াই ঘণ্টা। আর মাত্র আড়াই ঘণ্টা। তারপরই এই তীব্র মানসিক যন্ত্রণার পলে পলে নিষ্পেষণ থেকে সে মুক্তি পাবে। দুইমাস ধরে নিরুপায় এই অপমান আর মর্মান্তিক লজ্জার পীড়ন। পারছে না, পারছে না আর সহ্য করতে নির্মল। শুধু তাই নয়, যেভাবে ষড়যন্ত্রের জাল তাকে চার পাশ থেকে ঘিরে ধরেছে, এ জাল ছিঁড়ে কোনদিন যে সে আবার সহজ মুক্ত নিষ্কলঙ্ক জীবনের মধ্যে ফিরে যাবে সেও সুদূর পরাহত। কোন নিশ্চয়তাই নেই। একটি মাত্র ক্ষীণ আশা, সেও এখন পলকা সুতোয় ঝুলছে, যে কোন মুহূর্তে সেটা ছিঁড়ে যেতে পারে। তবে কেন কেন এ অত্যাচার সে সহ্য করবে। না, না—সে মুক্তিই দেবে। সৌভাগ্য এমনি করে যখন তার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, মূর্খের মত সে তাকে ফিরিয়ে দেবে না। দেখতে চায় সে একবার, এ অন্যায়ের প্রতিকার আছে কি না। এই জুলুম এই অত্যাচারের কোন মীমাংসা আছে কি না। হে অদৃশ্য লিপিকার। হে অদৃশ্য সুহৃদ, তুমি যেই হও তোমাকে নমস্কার।····

উঃ কি দীর্ঘ মন্থর এই রাত্রির প্রহরগুলি। কখন, কখন রাত দুটো বাজবে।

বাবু!

কে? চমকে তাকালো বাহিরে অন্ধকারের দিকে নির্মল। ইতিমধ্যে কখন তালা খুলে গিয়েছে দরজার নির্মল টেরও পায়নি। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রহমান।

আসুন, আর দেরি করবেন না।

বেরিয়ে এলো নির্মল। এক মুহূর্ত আর দেরি করলো না। লম্বা একটা টানা বারান্দা, তারপরই সরু একটা প্যাসেজ জেল প্রাঙ্গনের গা ঘেঁষে। বৃষ্টিও তখন যেন নেমেছে একেবারে আকাশ ভেঙ্গে। ঝম্ ঝম্ করে যেন বাজনা বাজছে। নিঃশব্দে রহমানের পিছনে পিছনে সরু প্যাসেজটা অতিক্রম করে দ্বিতীয় দ্বারপথে আর একটি ছোট প্রাঙ্গনে এসে পড়লো নির্মল। সেটা পার হয়ে দুজনে এসে একটা ঘরে ঢুকলো।

॥ আট ॥

ঘরে ঢুকেই রহমান দরজাটা ভিতর থেকে এঁটে দিল। অন্ধকার ঘর। সুইচ টিপে আলো জ্বালালো রহমান। সামান্য আসবাব ঘরটার মধ্যে। একপাশে একটি লোহার খাট। একটি ছোট স্টিল ট্রাংক রং চটা। তার পাশে একটা ষ্টোভ, একটা জলের কুঁজো ও একটা এ্যালুমিনিআমের টি-পট্। দড়ির আলনায় রহমানের আর এক প্রস্থ পোষাক ঝুলছিল। হাত বাড়িয়ে সেই পোষাকটা তুলে নির্মলের হাতে দিতে দিতে রহমান বললে, চটপট এই পোষাকটা গায়ে দিয়ে নিন বাবু।

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রহমানের নির্দেশমত নির্মল পোষাক বদলে নিল। রহমান অতঃপর বিছানার তলা থেকে একটা প্যাকেট করা ধুতি ও সার্ট বের করে ওর সামনে রেখে বললে, বসুন, ঐ যে খুর আয়না সব রয়েছে তাড়াতাড়ি দাড়ি গোঁফগুলো কামিয়ে নিন।

আরো মিনিট পনের বাদে রহমানের সাহায্যে নির্মল যখন জেলের বাইরে এসে দাঁড়ালো, বৃষ্টির ঝাপটায় চারিদিক তখন কুয়াশাচ্ছন্ন। এক হাতের মধ্যেও দৃষ্টি চলে না। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো চোখেমুখে এসে যেন ছুঁচ ফোটায়। সব কিছু অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চললো সেই ঝড় জল অন্ধকারের মধ্যেই নির্মল।

রহমান।

জেলের মেট্ রহমান খুশির উচ্ছলতায় গুণ গুণ করে একটা সিনেমার গান

গাইতে গাইতে নিজের ঘরে এসে ঢুকলো। পকেটের মধ্যে করকরে একগাদা নোট। কাজও হাসিল। বাকী যা রহমান ম্যানেজ করে নেবে। বিছানার নিচে লুকানো একটা বোতল ছিল, সেটা টেনে বের করে দাঁত দিয়ে ছিপিটা খুলে নির্জলা খানিকটা এ্যালকহল গলার মধ্যে ঢেলে দিল। আর চাকরি করে কি হবে। এবারে ইস্তফা। তারপর গাঁয়ে গিয়ে রহিম শেখের বোন জুবেদাকে সঙ্গী করে ছোট একটি সুখের নীড় বাঁধবে সে।

ছুটি, ছুটি, এবারে ছুটি।

হঠাৎ নজরে পড়লো মেজের উপরে তখনো পড়ে আছে নির্মলের পোষাক-গুলো। শরীরের রক্তে নেশা তখন চন চন করছে। জামা কাপড়গুলো নষ্ট করে কি হবে। যদি গায়ে লেগে যায়। নিজের জামা কাপড় গা থেকে খুলে একে একে নির্মলের পরিত্যক্ত জামা কাপড়গুলো পরিধান করলো রহমান। দেওয়ালে একটা আর্শী ঝোলানো ছিল সেটার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো কেমন মানিয়েছে। না। নেহাৎ খারাপ দেখাচ্ছে না। বরং বেশ মানিয়েছে বলতে হবে। ওষ্ঠের উপরে পুরুষ্টু গোঁফে একবার তা দিয়ে, নূর দাড়িতে সস্নেহে একবার হাত বুলিয়ে আর্শীর বুকে প্রতিফলিত নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে মুচোকি হাসলো রহমান। তারপর আর একবার খাটের উপরে বসে বোতলটা খুলে আরো খানিকটা তরল পদার্থ গলার মধ্যে ঢেলে দিল। গুণ গুণ করে একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে একটা সিগ্রেট ধরালো। শয্যার ওপর তারপর গাটা এলিয়ে দিয়ে ধূমপান করতে লাগলো।

কিন্তু ক্ষিধেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। নির্মলের পালাবার সব ব্যবস্থা করার উত্তেজনার মধ্যে রাত্রে তখনও পর্যন্ত কিছু খাওয়া হয়নি। চারটে আন্ডা ষ্টোররুম থেকে গতকাল সরিয়ে এনে ঘরে রেখে দিয়েছিল। উঠে বসলো রহমান। ষ্টোভটা জ্বালিয়ে আন্ডাগুলো ভেজে নেওয়া যাক। এ্যালকহলের নেশা মস্তিস্কের কোষে কোষে তখন অগ্নিপ্রবাহ ছড়াচ্ছে। স্পিরিট ঢালতে গিয়ে নেশার ঝোঁকে বোতল থেকে একগাদা স্পিরিট, ষ্টোভের গা বেয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়লো কিন্তু রহমানের সেদিকে নজর দেবার মত অবস্থা তখন নয়। দিয়াশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালালো।

আগুনের একটা নীলাভ ঝলক। একটা প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দ। একটা মৃত্যু-কাতর শেষ চিৎকার। লকলকে আগুনের শিখা যেন শতবাহু মেলে ঘরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

শব্দে প্রহরী ছুটে এলো। হৈ হৈ চিৎকার : আগুন, আগুন—

পাগলা ঘণ্টি রাতের স্তব্ধতাকে দীর্ণ বিদীর্ণ করে বেজে ওঠে ঢং....ঢং....ঢং।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। শুধু বর্ষণক্লান্ত ভিজা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে প্রথম ভোরের আলো যেন স্নিগ্ধ চন্দনের প্রলেপ দিচ্ছে।

॥ নয় ॥

পরের দিন বেলা তখন সাড়ে সাতটা কি আটটা হবে, বালীগঞ্জ রেল ষ্টেশনের কাছাকাছি একটা মাঝারী রেষ্টুরেণ্ট, 'চা-ঘর', মাথায় আদ্দির চিকনের কাজ করা টুপি, চোখে চশমা, পরিধানে ধুতি ও চুড়িদার পাঞ্জাবী এক তরুণ যুবক চা পান করতে করতে ঐ দিনকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিশেষ সংবাদটি পড়ছিল।

॥ সেণ্ট্রাল জেলের মধ্যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। হত্যাপরাধী বিচারাধীন আসামী নির্মল চৌধুরীর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় শোচনীয় মৃত্যু ও জেল মেট্ বজলুল রহমানের রহস্যময় অন্তর্ধান ॥

বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী নরেন্দ্রনাথ ঘোষের ও তাঁর অফিস ম্যানেজার শ্রীনাথ করের হত্যাপরাধে ধৃত নরেন্দ্রনাথেরই প্রাইভেট সেক্রেটারী নির্মল চৌধুরী—বিচারাধীন আসামীকে জেল কক্ষের মধ্যে অগ্নিদগ্ধ মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। যে সেলের মধ্যে নির্মল চৌধুরী আটক ছিল তাহার দরজার তালাটি ভগ্ন অবস্থায় দরজার গোড়াতেই পড়িয়াছিল। এবং জেলে মেথর প্রবেশের যে দ্বারটি ছিল তাহারও তালাটি ভগ্নাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। আর ঐ সঙ্গে জেল মেট্ বজলুল রহমান নিরুদ্দেশ। জেল কর্তৃপক্ষের ধারণা বজলুল রহমানের অন্তর্ধান ও নির্মল চৌধুরীর অগ্নিদগ্ধাবস্থায় শোচনীয় মৃত্যুর মধ্যে একটি রহস্যপূর্ণ যোগাযোগ নিশ্চয়ই আছে। সরকার পক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন পলাতক বজলুল রহমানকে কেহ ধরাইয়া দিতে পারিলে হাজার টাকা নগদ পুরস্কার পাইবেন।

বিচারাধীন হত্যাপরাধে অপরাধী নির্মল চৌধুরী মৃত।

সংবাদপত্রে উক্ত সংবাদটি পাঠ করতে করতে যুবকের ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসির একটা ঝিলিক খেয়ে যায়। হত্যাপরাধে অপরাধী আদালতে বিচারাধীন নির্মল চৌধুরী আজ জগতের চোখে অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে মৃত আর জেল মেট বজলুল রহমান রহস্যজনক ভাবে নিরুদ্দিষ্ট।

পুলিশ খুঁজছে রহমানকে। খোঁজ যত খুশী, স্বর্গ মর্ত পাতাল, যেখানে খুশী খোঁজ। যত পারো খোঁজ।

আর নির্মল চৌধুরী, তুমি আজ মৃত। আগুনে পুড়ে তুমি দগ্ধে দগ্ধে মরেছো। হত্যাপরাধে অপরাধী, বিচারাধীন আসামী নির্মল চৌধুরী তোমার আর কোন অস্তিত্বই পৃথিবীতে আজ নেই।

বাইরের রাস্তায় একদল শবযাত্রীর মিলিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, বল হরি, হরি বোল! যুবকের বুকখানা কাঁপিয়ে কি একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো।

দুটো দিন দুটো রাত অনির্দিষ্ট উদ্‌ভ্রান্তের মত যুবক শহরের আশে পাশে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালো। কোথায় যাবে আজ সে। পরিচিত জনদের দুয়ার আজ তার সামনে বন্ধ! আর অপরিচিত যারা তারা তো দুয়ার খুলবেই না। অজ্ঞাত কুলশীল। কত চেনা মুখ মনে পড়ে কিন্তু আশার বিন্দুমাত্র আলোও কোথাও নেই।

মুহূর্তের হঠকারীতায় এ কি করলো সে। এই অপরিচিত নামহীন চোরের মত আত্মগোপনের মর্মান্তিক পীড়ন ও নিরাশার চাইতে সেই জেল প্রকোষ্ঠের মধ্যে মুক্তির ক্ষীণতম আশা নিয়ে অধীর প্রতীক্ষায় দিন গণনা যে ঢের সুখের, শান্তির ছিল। জেল থেকে পালানোর সঙ্গে সঙ্গে যে তার এতদিনকার কষ্টার্জিত জীবনের সমস্ত পরিচয় সমস্ত অধিকারকে যে সে নিজ হাতে মুছে দিয়ে এসেছে। কেন সে উত্তেজনার মুখে একবারও এ কথাটা ভাবেনি!

মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে এই সাতাশ বছরের জীবনটা, কত আশা, কত আকাঙ্খা নিয়ে যা সে তিল তিল করে গড়ে তুলেছিল, তার সমস্ত অস্তিত্ব, সমস্ত স্বীকৃতি সে এমনি করে একটি প্রলোভনের মুহূর্তের উত্তেজনায় জেল প্রকোষ্ঠের মধ্যে ফেলে রেখে চলে এলো। এ সে কি করলো!

আসার সময় রহমান তার জামার পকেটে দশটাকার গোটা দুই নোট দিয়ে দিয়েছিল, তাও প্রায় শেষ হয়ে এলো। সামান্য গোটা সাতেক টাকা অবশিষ্ট আছে। তারপরই তো কপর্দকহীন অবস্থা! পরিচয়হীন শূন্য পকেট, সামনে নিষ্ঠুর বাস্তব মুখব্যাদন করে আছে।

সেদিন এক পার্কের এক বেঞ্চিতে সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে বসে সংবাদপত্রে একটা নিউজ পড়তে পড়তে হঠাৎ একটা পরিকল্পনা মাথার মধ্যে উঁকি দিয়ে গেল বিদ্যুৎচমকের মত। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়াল। ঠিক। ছাত্রজীবনের সবার চাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু তার জহর।

ডাঃ জহর সেন! এফ্, আর, সি, এস। প্লাষ্টিক সার্জারীর অন্যতম বিশেষজ্ঞ! সংবাদপত্রটা হাতে করে উঠে দাঁড়াল সে।

এককালে কলেজ জীবনে নির্মল চৌধুরীর পরম বন্ধু ছিল ধনী ব্যারিষ্টারের একমাত্র পুত্র জহর সেন। বি-এস্ সি ডিগ্রী নিয়ে, কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে সার্জারীতে অনার্স নিয়ে এম-বি পাশ করার পর, জহর সাগর পাড়ি দিয়েছিল। এফ্, আর, সি, এস হয়ে প্লাষ্টিক সার্জারীর অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বিলাতের বিখ্যাত এক প্লাষ্টিক সার্জেনের সহকারী হিসাবে সুদীর্ঘ চার বৎসর অভিজ্ঞতা অর্জনের পর জহর সেন আবার দেশে ফিরে এসে টালীগঞ্জ অঞ্চলে তার পৈতৃক বাড়ীতেই নিজস্ব এক সার্জারী তৈরি করে প্রাক্‌টিস করছে গত বছরখানেক ধরে।

জহর তার সমস্ত ইতিহাস শুনলে নিশ্চয়ই তাকে ফেলে দেবেনা, চিরদিনের

জন্য না হলেও কিছুকালের জন্য তাকে তার গৃহে আশ্রয় দেবেই। জহর আজও অবিবাহিত এবং গৃহে তার চাকর বাকর ছাড়া লোকজনও নেই। কিছু কালের জন্য অন্তত আত্মগোপন করে থাকবার মত জহরের গৃহ ব্যতীত অন্য কোন স্থান আপাতত ওর মনে পড়েনা। তাছাড়া জহরের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা কোন পথও হয়ত খুঁজে বের করা যেতে পারে!

রাত্রি তখন সাড়ে বারটা হবে। টালীগঞ্জ অঞ্চলে বিরাট কম্পাউন্ডওয়ালা জহরের পৈতৃক বাড়ীটা যেখানে, সে অঞ্চলটা একেবারে তখন যেন ঘুমের স্তব্ধতায় তলিয়ে গিয়েছে। রাস্তার দুধারে গ্যাসপোস্টগুলো কেবল ঈষৎ নীলাভ একচক্ষু মেলে অতন্দ্র প্রহরীর মত ঠায় একপায়ে দাঁড়িয়ে।

ডাঃ জহর সেন কিন্তু তখনো জেগেই ছিল। তার নির্জন বাড়ীর একতলায় বসে টেবিল ল্যাম্পের মৃদু আলোয় একটা সার্জারীর জার্নাল পড়ছিল গভীর মনোযোগের সঙ্গে। পুরানো চাকর শম্ভু আজ দশদিন হলো ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছে একমাসের জন্য। আর একজন চাকর, ঠাকুর তারাও যে যার কাজ সেরে ঘুমোচ্ছে। সমস্ত বাড়ীটার মধ্যে একা জেগে ছিল জহরই। স্টাডির কাচের সার্সীর ওপাশে একটা মুখ চকিতের জন্য দেখা গেল। তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী এক জোড়া চক্ষু।

টুক্ টুক্ টুক্‌....কাচের সার্সীর গায়ে মৃদু টোকা পড়লো।

প্রথমবার সে ক্ষীণ শব্দ জহরের কানে প্রবেশ করেনা। আবার পূর্বের মত টোকা পড়তেই মুখ ফিরিয়ে জানালার দিকে শব্দ অনুসরণ করে তাকালো জহর।

সার্সীর ওপাশে একটা মুখ।

কে? কে ওখানে? ত্বরিতপদে উঠে দাঁড়াল জহর এবং এগিয়ে গেল জানালার দিকে। মুখটা কিন্তু সরেনা।

চকিতে কাচের সার্সী খুলে ফেলে জহর: কে?

আমি।

কে?

আমি, আমি—নির্মল!

এবারে সত্যিই চমকে ওঠে জহর—নির্মল!

হ্যাঁ, নির্মল চৌধুরী।

নির্মল! বিস্ময়ে উত্তেজনায় গলার স্বর যেন বুজে আসে জহরের। এ কি অসম্ভব ব্যাপার। খবরের কাগজে তবে যে দুদিন আগে নিউজ বের হয়েছে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে নির্মল চৌধুরী মারা গিয়েছে।

সত্যিই আমি নির্মল জহর। আগুনে পুড়ে আমি মরিনি।

ঘরের মধ্যে মুখোমুখি দুজনে। নির্মল আর জহর। অখণ্ড স্তব্ধতার মধ্যে ঘড়ির পেণ্ডুলামটা কেবল একঘেয়ে টক্ টক্ একটা শব্দ তরঙ্গ জাগিয়ে চলেছে। এখনো বিশ্বাস করতে পারছিনা, সত্যিই আমি নির্মল।

কিন্তু—

সব শুনবি। আগে এককাপ চা খাওয়াতে পারিস?

চল, উপরে চল্—

তাই চল্।

আরো ঘণ্টাখানেক পরে।

জহরের শোবার ঘরে দুজনে পাশাপাশি দুটো সোফায় বসে। নির্মল সংক্ষেপে তার সমস্ত কাহিনী জহরকে বলে একটু থেমে ওর মুখের দিকে তাকাল।

তারপর?

তারপর আর কি। পুলিশের চোখে আজ আমি মৃত হলেও এই কলকাতা শহরে এমন অনেক বন্ধু বান্ধব ও পরিচিতের দল আছে যারা হয়ত আমাকে দেখলেই চিনে ফেলবে।

তা সত্যি! কিন্তু একাজ তুই করতে গেলি কেন নির্মল! হয়ত বিচারে শেষ পর্যন্ত তুই মুক্তি পেতিস! কিন্তু এরপর—

হয়ত পেতাম আবার হয়ত নাও পেতে পারতাম। কিন্তু অনিশ্চয়ের সে প্রতীক্ষার যন্ত্রণা যে কি সে যাকে আমার মত এই দু'মাস ধরে কারাকক্ষের এক প্রকোষ্ঠে বসে সহ্য করতে হয়েছে শুধু সেই জানে। বিশ্বাস না হয় করলাম জহর শেষ পর্যন্ত হয়ত বা মুক্তি পেতাম কিন্তু তার আগে হয়ত পাগল হয়েই যেতাম!

জহর চেয়ে থাকে বন্ধুর মুখের দিকে।

নির্মলের গলার স্বর কাঁপছে যেন এক মর্মান্তিক রুদ্ধ আক্রোশে। সে আবার বলে, তাছাড়া কেন, কেন এ অত্যাচার মুখ বুজে আমি সহ্য করবো বলতে পারিস জহর, কেন দুর্বল অশক্তের মত মাথা পেতে নেবো এ অন্যায়, এ অত্যাচার!

জহর কোন কথা বলে না চুপ করে থাকে।

নির্মল তখনো বলে চলেছে, যে অন্যায়, যে অত্যাচার আমার উপরে হয়েছে তার প্রতিশোধ আমি নেবো! তাকে—তাকে আমি ছাড়বো না!

কি বলছিস্ নির্মল! তাকে তুই চিনিস?

চিনিনা নামও তার জানি না। তাছাড়া নেশার ঘোরের মত আবছা তখন আমার স্মৃতিশক্তি। তবু তবু তার গলার স্বরটা আজও আমার মনে আছে। তাকে আমি যেমন করে হোক খুঁজে বের করবোই। করতে আমাকে হবেই—

কিন্তু কি করে তা সম্ভব হবে নির্মল। তুই বলছিস তাকে চিনিস না, তার নাম পর্যন্ত জানিস না তুই।

কিন্তু তার গলার স্বর?

গলার স্বর তো কতজনের একরকম হতে পারে।

তা পারে। তবু—তবু তাকে আমি ঠিক খুঁজে বের করতে পারবো। কেবল তুই—তুই যদি আমাকে একটু সাহায্য করিস।

আমি! আমি তোকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

পারিস। আর সেই জন্যই তোর কাছে আমি এসেছি।—বলতে বলতে পকেট থেকে ভাঁজ করা সংবাদপত্রটা বের করে দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় একটা নিউজের উপরে জহরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নির্মল বললো, এই যে নিউজের সঙ্গে আজকের কাগজে পাশাপাশি দুটি ফটো ছাপা হয়েছে একই ব্যক্তির এর মুখে প্লাষ্টিক অপারেশান তো তুই-ই করেছিস?

হ্যাঁ।

আশ্চর্য অপারেশান করেছিস! কে বলবে যে এরা একই ব্যক্তি।

এতক্ষণে জহর ব্যাপারটা বুঝতে পারে। বুঝতে পারে নির্মল তাকে কি বলতে চায়। বিস্ময়ে জহর নির্মলের মুখের দিকে তাকাল। বললে, এ তুই কি বলছিস নির্মল!

হ্যাঁ, অপারেশন করে তুই আমার মুখের এমন একটা অদল বদল করে দে যাতে করে পরিচিতেরা কেউ আর আমায় চিনতে না পারে।

কিন্তু—

কিন্তু নয় জহর, এটা তোকে করতেই হবে ভাই। এছাড়া আজ আর আমার বাঁচবার দ্বিতীয় কোন পন্থাই নেই—

জহর যেন নির্মলের প্রস্তাবে কেমন চিন্তিত হয়ে পড়ে। বলে, দুটো দিন আমাকে ভাববার সময় দে ভাই। তুই যা বলছিস—

বেশ। ভাবতে চাস তুই ভাব। কিন্তু এটা তোকে করে দিতেই হবে।

দিন কয়েক পরে এক গভীর রাত্রে শেষবারের মত নির্মলের মুখে প্লাষ্টিক সার্জারির ছুরি চালিয়ে ডাঃ জহর সেন অপারেশন থিয়েটার থেকে বের হয়ে এলো—নির্মলকে ওষুধের প্রভাবে ঘুম পাড়িয়ে।

আরো দিন কুড়ি পরে। একটা মস্তবড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘরের আলোয় নির্মল দেখছে তার নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে—প্রতিফলিত মসৃণ আয়নার কাচের গায়ে। পরিধানে মার্সেরাইজড্ লাইট্ ব্লু রংয়ের সিল্কের সুট্।

পরিবর্তন! হ্যাঁ পরিবর্তন এমনি হয়েছে যে নিজেকেও আজ সে নিজে চিনতে পারবে না। সেই উন্নত খড়্গের মত নাক, দুদিকে যেন চেপে বসে

বিশ্রী কুৎসিত থ্যাবড়া হয়ে গিয়েছে। ডান দিককার ভ্রূটা খানিকটা উঠে গিয়ে আগেকার সেই সুন্দর বাঁকানো যুগ্ম ভ্রূ চিরদিনের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। মুখের দুপাশে গালের ওপরে কয়েকটা কঠিন রেখা হঠাৎ যেন দেখা দিয়ে পূর্বের সেই নমনীয় শান্ত মুখশ্রীকে রুক্ষ ও কর্কশ করে তুলেছে। বাম দিককার চোখের বহির্কোণটা কেমন যেন একটু বেঁকে নিচের দিকে নেমে এসেছে! বাঁ দিককার কপালে একটা ক্ষত চিহ্ন। ডান দিককার চোয়ালে একটা কালো তিল। বাটারফ্লাই গোঁফ। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। চোখে কালো মোটা সেলুলয়েড ফ্রেমের চশমা।

পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল জহর; সে প্রশ্ন করে, কিরে, চিনতে পারছিস আর নিজেকে?

না।—ফিরে তাকালো নির্মল। বললে, থ্যাংক ইউ। নাউ নির্মল চৌধুরী, ইজ্ ডেড্। মৃত নির্মল চৌধুরীর দেহে আজ আবার নতুন প্রাণ নিয়ে, নতুন জীবন নিয়ে বেঁচে উঠুক সলিল চৌধুরী।

॥ দশ ॥

পরের দিন রাত্রে।

একটু আগে রাত তিনটের সংকেতধ্বনি শোনা গিয়েছে। জহরেরই বাড়ীর একতলার একটা ঘরে বিনিদ্র শয্যার 'পরে শুয়ে ছিল নির্মল। ঘুম ছিল না চোখে। এলোমেলো চিন্তা একটার পর একটা কেবলই যেন মস্তিষ্কের কোষে কোষে জট পাকাচ্ছিল।

ঘরের দরজাটা ভেজানোই ছিল। ধীরে ধীরে অত্যন্ত মৃদু একটা শব্দ তুলে ঘরের ভেজানো দরজাটা খুলে গেল।

কে! ধড়ফড় করে শয্যার 'পরে উঠে বসে নির্মল।

অন্ধকারে অদূরে ঘরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট একটা দীর্ঘ ছায়ামূর্তি।

কে! কে ওখানে?

মৃদু চাপা পুরুষ কণ্ঠে এবারে জবাব এলো, ভয় পাবেন না নির্মলবাবু, আমি—

কে! কে তুমি?

আমাকে আপনি তো চিনবেন না। তবে শুধু এইটুকু পরিচয় দিলেই হয়ত যথেষ্ট হবে যে, আমারই সাহায্যে আপনি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

আপনি!

হ্যাঁ। কিন্তু থাক সে কথা। এ ক'দিন আপনাকে সর্বত্র আমি অনুসরণ করে এসেছি। আপনার আজকের চেহারার পরিবর্তনও আমার অজ্ঞাত নয়—

সেকি!

হ্যাঁ। তার জন্য ভয়ের কিছু আপনার নেই। কারণ আমি জানি আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

আপনি জানেন!

হ্যাঁ। আর শুধু তাই নয়, যে আপনার এতবড় ক্ষতি করেছে, যে আপনাকে মিথ্যা হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িয়েছে—

আপনি, আপনি তাকে চেনেন?

না। তবে অনুমান করেছি একটা। কিন্তু কেবলমাত্র অনুমানেই তো হবে না কিছু, প্রমাণ চাই আজকের দিনে। আর সেই প্রমাণ যেমন করে হোক আমাদের খুঁজে বের করে হাতে নাতে তাকে ধরতে হবে।

কিন্তু—

তার জন্য সময়ের প্রয়োজন। অপেক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু এবারে আপনি কি করবেন কিছু ভেবে ঠিক করতে পারলেন?

না। সেই কথাই তো ভাবছি আজ ক'দিন ধরে।

আমি একটা পথ আপনাকে বাতলাতে পারি।

কি?

বি এন এণ্ড এন ঘোষ কোম্পানীর সঙ্গে তো আপনি কিছুটা পরিচিত?

হ্যাঁ।

বি এন এণ্ড এন ঘোষ ও এন এন ঘোষ কোম্পানী আজ এ্যামালগেমেটেড হয়ে মেসার্স ঘোষ এণ্ড কোম্পানী হয়েছে আবার। সেখানে শ্রীনাথ করের পোষ্টটা আজও খালি আছে—

শ্রীনাথ করের পোষ্ট!

হ্যাঁ, সেটাই চেষ্টা করুন।

কিন্তু—

ভয় করছেন কেন, আপনাকে তো চিনতে পারবে না।

কিন্তু আমার পরিচয়?

এই চিঠিটা নিয়ে কালই দেখা করুন,—বলতে বলতে ছায়ামূর্তি একটা চিঠির খাম ছুড়ে দিল নির্মলের দিকে। তারপর আবার বললে, ঐ চিঠির বাহকের নাম হচ্ছে, বিকাশ রায়। নামটা মনে রাখবেন। মান্দ্রাজ ওরিয়েণ্টাল ফার্ম থেকে আপনি আসছেন। কথাগুলো মনে থাকবে?

থাকবে।

আপনি আসছেন এস্ রাঘবণের কাছ থেকে।

বেশ।

তাহলে এবারে চলি, গুড্ নাইট।—ছায়ামূর্তি পরক্ষণেই ঘর থেকে অদৃশ্য হলো।

॥ এগার ॥

বজলুল রহমানের রহস্যজনক নিরুদ্দেশ ও সেই সঙ্গে আকস্মিক নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীনাথ করের হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত, বিচারাধীন মামলার আসামী নির্মল চৌধুরীর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় আরো রহস্যজনক ভাবে মৃত্যুর ব্যাপারে পুলিশের কর্তৃপক্ষের মনে নির্মল চৌধুরী সম্পর্কে পূর্ব সন্দেহটা দৃঢ়মূল হলেও সুব্রত বা কিরীটি কিন্তু অত সহজে পুলিশের স্বপক্ষে রায় দিতে পারেনি। এবং সমগ্র ব্যাপারটার মধ্যে যে আরো দুর্জ্ঞেয় একটা রহস্য নিহিত আছে এটাই বরং তাদের দৃঢ়বদ্ধ ধারণা হয়েছিল। এবং পুলিশের দিক থেকে আপাততঃ ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেলেও সুব্রত একেবারে স্থির নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিল না।

সেদিন দ্বিপ্রহর থেকে বৈকাল পর্যন্ত সেই ব্যাপার নিয়েই কিরীটির বাড়ীতে তাঁর দোতালার বসবার ঘরে দুজনার মধ্যে আলোচনা চলছিল।

সুব্রত বলছিল, সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে যে একটা মস্তবড় রহস্য জড়িয়ে আছে আমারও তাই ধারণা।

শুধু তাই নয় সুব্রত—কিরীটি জবাব দেয়, অত্যন্ত বিশ্রীভাবে দগ্ধ যে মৃতদেহটা জেল প্রকোষ্ঠের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে সেটা যে আসলে কার মৃতদেহ, নির্মল চৌধুরী না রহমানের সেটাও বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখবার।

কথাটা যে আমিও ভাবিনি তা নয় কিরীটি।—কিন্তু—

এটা অবিশ্যি ঠিক যে দুজনার একজন মারা গেছে। তেমনি অন্যজন পলাতক এও ঠিক। আর সেই দিক দিয়ে ঘটনাটার বিচার করতে গেলে বজলুল রহমানের মৃত্যুর একরকম তাৎপর্য আবার নির্মল চৌধুরীর মৃত্যুরও সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাৎপর্য। সমগ্র ঘটনার সত্যাসত্যের উপরে বর্তমান কেসের সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটো দিক নির্ভর করছে।

সুব্রত কিরীটির কথা চুপ করে শুনতে থাকে।

কিন্তু আসল ঘটনার সত্যাসত্যের কথা ছাড়াও আর একটা কথা ভাববার আছে। আকস্মিক ঐ দুর্ঘটনাটা ঘটতেই বা গেল কেন? কিরীটি আবার বলে।

আসল কালপিট মানে নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীনাথ করের হত্যাকারীরও তো এই ব্যাপারে হাত থাকতে পারে। বলে সুব্রত।

সম্ভবত না।

কেন?

কারণ একটা কথা ভেবে দেখ, জেল থেকে নির্মল চৌধুরীকে যদি সরাবারই মতলব করা হয়ে থাকে তাতে হত্যাকারীর লাভটা কি? যাকে অমন চমৎকার ভাবে অভিযুক্ত করে জেলের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, হত্যাকারী তাকেই

আবার পালাবার পথ করে দেবে এটার মধ্যে কোন যুক্তি থাকতে পারে বলে তোর মনে হয়। কারণ এখন তো বুঝতে পারছিস হত্যার সঙ্গে নির্মল চৌধুরীর কোন যোগাযোগই ছিল না। তাকে কৌশলে জালে আবদ্ধ করা হয়েছিল মাত্র।

কিন্তু নির্মল চৌধুরীর জেল থেকে পালাবার দিকটাই যদি ভেবে নিই তাহলে কে তাকে, এমন ইন্টারেস্টেড পার্টি যে বা যারা জেল থেকে তাকে পালাতে সাহায্য করতে পারে? সুব্রত পাল্টা প্রশ্ন তোলে এবারে।

সেটা পরে ভাববার বিষয়। আপাতত তোকে যা বলেছিলাম বিনয়েন্দ্র ঘোষ ও তস্য ভাইঝি শ্রীমতী নমিতা (বেবী) ঘোষের ওপর একটু নজর রাখতে, রেখেছিস?

হ্যাঁ।

এখন তো কোন অসুবিধাই নেই তোর, বেবী ঘোষের সঙ্গে যখন আলাপ হয়ে গিয়েছে মধ্যে মধ্যে এখন সেখানে যেতেও তো পারিস।

যাবো।

নরেন্দ্রবাবুর ছেলেও তো ফিরেছে শুনলাম। তার সঙ্গে আলাপ হলো?

না, এখনো সুযোগ করে উঠতে পারিনি।

বিমলাদেবী সম্পর্কে একেবারে নিশ্চেষ্ট থাকিস না কিন্তু—

তুই দেখছি বিমলাদেবীকে একেবারে ভুলতেই পারছিস না কিরীটি।

হাসিখুশির সেই কবিতাটা তোর মনে আছে নিশ্চয় সুব্রত।

কোন্ কবিতাটা?

প্রত্যুত্তরে কিরীটি মৃদু কণ্ঠে আবৃত্তি করে—

বুলবুলিটির মুখটি কালো।
ভালুক জানে বাসতে ভালো।

মানে?

বুঝে দেখ।

ঐ দিনই রাত তখন আটটা বেজে মিনিট দশ পনের হবে। দক্ষিণ কলকাতার কোন একটি চিত্রগৃহে ক্যাবলাকুমার ও মিতা মিত্রের অভিনীত নতুন একটি বাংলা চিত্র রিলিজ করায় দর্শকের বেজায় ভিড়। দ্বিতীয় শো শুরু হতে আর মিনিট পনের বাকী। রাস্তায় মানুষ ও গাড়ির ভিড়ে তিল ধারণেরও স্থান নেই। সুব্রতও সেই ভিড়ের মধ্যে ফিরতি পথে গাড়ি নিয়ে আটকে পড়েছে।

সহসা সিনেমা থেকে কিছু দূরে কার পার্কের কাছে একটা জনতার বেশী রকম ভিড় ও ঠেলাঠেলির কৌতূহল দেখে সুব্রত নিজের গাড়িটা একপাশে পার্ক করে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল ব্যাপারটা কি জানবার জন্য।

কি হয়েছে মশাই? ব্যাপার কি?

কে একজন জবাব দেয়, গাড়ির মধ্যে একটা লোক মারা গেছে।

গাড়ির মধ্যে লোক মারা গেছে? সুব্রত কৌতূহলে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, এগিয়ে দিয়ে দেখুন না। এক ভদ্রমহিলার ড্রাইভার।

সুব্রত আরো এগিয়ে গেল। লাল পাগড়ীরও তখন সেখানে আবির্ভাব হয়েছে। সেই লাল পাগড়ীর সাহায্যেই, নিজের পরিচয় দিয়ে সুব্রত ভিড় খানিকটা দুপাশে সরিয়ে দিয়ে নির্দিষ্ট গাড়িটার খুব কাছে এগিয়ে গেল।

একটা মেরুন কলারের চকচকে বিরাট প্লিমাউথ গাড়ি।

গাড়ির ঠিক সামনেই খোলা দরজাটার হ্যাণ্ডেলটা ধরে, বটুয়া হাতে সুবেশা একটি তরুণী দাঁড়িয়ে আছে তখনো। তার চোখে মুখে একটা ভয় ও বিস্ময়ের ছায়া। অদূরে লাইট পোষ্টের আলো তরুণীর চোখে মুখে এসে পড়েছে। তরুণীর মুখের দিকে তাকিয়েই কিন্তু সুব্রতর মনে হয় মুখটা চেনা চেনা।

সুব্রত কৌতূহলে আরো সামনে এগিয়ে গেল। লাল পাগড়ীও সুব্রতর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যায়। এবারে আর চিনতে কোন কষ্ট হয় না। শ্রীমতী বেবী ঘোষ।

কে! মিস্ ঘোষ না?

সুব্রতর প্রশ্নে চমকে ফিরে তাকায় বেবী, কে?

চিনতে পারছেন না। আমি সুব্রত—

হ্যাঁ, হ্যাঁ—মনে পড়েছে।

কিন্তু ব্যাপার কি?

কিছুই তো বুঝতে পারছি না। দেখুন না কি বিভ্রাট। ড্রাইভারকে গাড়িতে বসিয়ে শো দেখতে গিয়েছিলাম। এসে দেখি লোকটা ডেড্।

হুঁ। বলে সুব্রত এগিয়ে গিয়ে গাড়ির ভিতর উঁকি দিতেই একটা ঝাঁঝালো কটু গন্ধ তার নাসারন্ধ্রে এসে যেন মৃদু একটা ঝাপটা দিল। আর সেই সঙ্গে নজরে পড়লো সামনের সীটে হেলান দিয়ে কে একজন বসে আছে। মাথাটা তার একপাশে হেলে পড়েছে। গাড়ির ড্যাসবোর্ডের আলোটা জেলে দিয়ে লোকটাকে পরীক্ষা করতেই সে বুঝতে পারে লোকটা মৃত।

সুব্রত অতঃপর পাশেই দণ্ডায়মান লালপাগড়ীর দিকে তাকিয়ে বলে, কি নাম তোমার সেপাইজী?

লছমন চৌবে সাব।

হুইসেল বাজিয়ে তোমার কোন সাথীকে ডেকে থানায় দারোগাবাবুকে একটা খবর দাও।

সেপাই তখুনি সজোরে হুইসেলে ফুৎকার দিল।

আরো ঘণ্টাখানেক বাদে পুলিশের জিম্মায় আপাতত গাড়ি ও মৃতদেহ রেখে সুব্রত বেবীকে বললো, চলুন আমার গাড়িতে, আপনাকে আপনাদের

বাড়ীতে ড্রপ করে দিয়ে যাই—

না, না—আমি ট্যাক্সী নিয়েই যেতে পারবোখন।—বেবী বলে।

তা পারবেন জানি। কিন্তু তবু আজ আমিই আপনাকে পৌঁছে দেবো চলুন।

সুব্রতর কণ্ঠস্বরে একটু যেন চমকেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে বেবী মৃদুকণ্ঠে বলে, চলুন।

গাড়িতে উঠে, সামনের সীটেই পাশাপাশি দুজনে বসে। ষ্টার্ট দিল গাড়িতে সুব্রত। ক্লাচ ছাড়তে ছাড়তে বলে, লেক টেরেসে তো আপনাদের বাড়ী?

হ্যাঁ।

সুব্রত গাড়ি ব্যাক্ করে মুখ ঘুরিয়ে নিল, এবং রসা রোড ধরে গাড়ি চালাতে চালাতে আবার প্রশ্ন করল, আপনার অভিভাবক তো বিনয়েন্দ্রবাবু, তাই না?

হ্যাঁ।

আপনার কাকা তো শুনেছি বিয়ে করেননি।

তাই, কিন্তু এসব কথা জানলেন কি করে আপনি?

আপনার বড় কাকা নরেন্দ্রবাবু আমার পরিচিত ছিলেন। তাঁর মুখেই সব শোনা। হ্যাঁ, ভাল কথা, শুনলাম আপনার বড় কাকার কোম্পানী ও আপনাদের কোম্পানী সব একত্র হয়ে গিয়েছে।

যায়নি এখনো, তবে যাচ্ছে। কাগজ পত্র সব তৈরী হচ্ছে।

হঠাৎ আবার সব একত্র হয়ে যাচ্ছে?

দাদা মানে রমেনদা, বড় কাকার ছেলে একা সব দেখা শোনা করতে পারবেন না বলে ছোটকাকার পরামর্শ মত সেই ব্যবস্থাতেই তিনি রাজী হয়েছেন।

ইতিমধ্যে গাড়ি প্রায় বেবীদের বাড়ীর কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। বেবীই বলে দেয়, ঐ যে লাল রংয়ের চতুর্থ কোলাপ্সিবল গেট্ওয়ালা বাড়ীটা, ওটাই আমাদের বাড়ী।

গাড়ি গেটের সামনে আসতেই শিখ দারোয়ান হর্ন শুনে গেট খুলে দিল। সুব্রত গাড়ি নিয়ে গেটের মধ্যে প্রবেশ করে একেবারে গিয়ে পোর্টিকোর নিচে গাড়ি থামাল।

বেবী গাড়ি থেকে নেমে বলে, নামবেন না?

না।

বাঃ রে, এককাপ চাও খেয়ে যাবেন না?

সে আর এক সময় হবে। একটা কথা বলবো ভাবছিলাম—

কি?

যখন তখন যেখানে সেখানে বিশেষ করে রাত্রে একা বেরুবেন না। আর রাত্রেও শোবার সময় ঘরের দরজা এ'টে শোবেন। একলা একটা ঘরেই শোন তো।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে বেবী বলে, হ্যাঁ, কিন্তু কেন বলুন তো। এসব কথা বলছেন কেন?

কথাটা আপনাকে তাহলে একটু খুলেই বলি মিস্ ঘোষ। আপনার আজকের ড্রাইভারের মৃত্যুটা আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ন্যাচারাল অর্থাৎ স্বাভাবিক মৃত্যু বা এ্যাকসিডেন্ট্ নয়।

কি বলছেন সুব্রতবাবু! বিস্মিত বেবী সুব্রতর মুখের দিকে তাকায়।

যা মনে হয়েছে তাই বললাম। কারণ এই মাত্র বললাম তো আপনাকে, আমার অনুমান যদি ভুল না হয় তো, আপনার জীবনের উপরেই কেউ না কেউ এ্যাটেম্পট্ নিশ্চয়ই নিয়েছিল আজ এবং সেদিক থেকে আপনার ড্রাইভারের মৃত্যুটা সম্ভবত ঘটনাচক্রেই ঘটে গিয়েছে।

সে কি!

হ্যাঁ, আর সেই জন্যই বলছিলাম, সর্বদা একটু সতর্ক থাকবেন। কারণ সত্যিই যদি আপনার লাইফের 'পরেই আজ এ্যাটেম্পট্ হয়ে থাকে তাহলে আবার এ্যাটেম্পট্ তারা করবেই।

বেবী সত্যিই যেন সুব্রতর কথায় বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যায়। এসব আবার কি কথা! তার জীবনের 'পরে এ্যাটেম্পট্!

আচ্ছা গুড্ নাইট। আজকে তাহলে চলি—

গুড্ নাইট।

বেবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইচ্ছা করেই সুব্রত ফিরতি পথে ভিড় বাঁচাবার জন্য বালীগঞ্জ সারকুলার রোড ধরেছিল।

এবং কিছুটা রাস্তা পার হবার পর হঠাৎ একটা জিনিষ তার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। সুব্রত সজাগ হয়ে ওঠে।

গাড়ির মধ্যেকার সামনের ভিউ মিরারে হঠাৎ সুব্রতর নজরে পড়ে, তার গাড়ির সঙ্গে বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে একটা কালো রংয়ের গাড়ি পিছনে পিছনে আসছে তার।

সুব্রত একবার গাড়ির গতি কমিয়ে দিল, পিছনের গাড়িটারও স্পিড সঙ্গে সঙ্গে কমে গেল। গাড়ি থামালো সুব্রত, পিছনের গাড়িটাও থামলো। এবারে নিঃসন্দেহ হয় সুব্রত যে, গাড়িটা তারই গাড়িটাকে ফলো করছে। নিজের মনেই হাসলো সুব্রত। এবং পরক্ষণেই হঠাৎ সুব্রত গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিল। একেবারে চল্লিশ মাইল।

বিকাশ রায়ের পরিচয়ে আশ্চর্য সত্যিই নির্মলের বিনয়েন্দ্রর অফিসে চাকরি পেতে কোন অসুবিধাই হলো না। বিনয়েন্দ্র ঘোষের নামে সে চিঠিটার মধ্যে কি লেখা ছিল নির্মল অবিশ্যি জানবার অবকাশ পায়নি, কারণ চিঠির মুখ আঁটা ছিল। বিনয়েন্দ্র চিঠিটা পড়ে সামান্য দু'চারটে মামুলী প্রশ্ন করেই নির্মলকে মৌখিক এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে বলে দিলেন পরের দিন থেকেই কাজে জয়েন করতে।

মৌখিক এ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়ে নির্মল বিনয়েন্দ্রর অফিস থেকে বের হতেই গেটের সামনে একটা ভিখিরি গোছের ছেলে সামনে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো, আপনার নাম বিকাশ রায় কি? বেশ একটু যেন বিস্মিত ও কৌতূহলী হয়েই নির্মল ছেলেটাকে শুধায়, হাঁ, কেন বলতো?

এই চিঠি—বলে ছেলেটি নির্মলের হাতে একটা চিঠি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে চলে গেল। বিস্মিত বিকাশ (নির্মল) একটু এগিয়ে গিয়ে একটা লাইট পোষ্টের নিচে দাঁড়িয়ে খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা বের করলো।

সংক্ষিপ্ত চিঠি। এবং পূর্ববৎ কোড লেটারে লেখা।

CHAKRI JODI HOE GEA THAKE, HOTELE UTHE JAN.

অর্থাৎ চাকরি হয়ে গিয়ে থাকলে আর যাতে সে জহরের ওখানে না থাকে তারই নির্দেশ। কে তুমি অদৃশ্য বন্ধু জানিনা, তোমার পরিচয়ও তুমি দেবেনা, বেশ দিওনা। তবে তোমার নির্দেশ মতই আমি কাজ করবো। মনস্থির করে ফেলে নির্মল। এবং সেই দিনই খুঁজে খুঁজে বৌবাজারের কাছাকাছি একটা হোটেলে তিন তলার একটা নিরিবিলি ঘর এনগেজ করে পরের দিন উঠে এলো এখানে শহরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে।

দিন সাতেক পরে পূর্ববৎ কোডেই আর একটা চিঠি এলো নির্মলের হাতে। এবং এবারের চিঠিটার অর্থ হচ্ছে তোমাকে যে জন্য মুক্তি দেওয়া হয়েছে সে কথাটা কি ভুলে গেলে। ভুলে গেলে কি যে তোমাকে হত্যার ষড়যন্ত্রের জালে ফেলে ফাঁসী কাঠের দিকে এগিয়ে দিচ্ছিল এক শয়তান। যদি বাঁচতে চাও তো সর্বাগ্রে তার মুখোসটা খুলে ফেলবার চেষ্টা করো। অফিসের সব ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখলেই অনেক কিছু জানতে পারবে। ইতি—

অফিস সংক্রান্ত একটা জরুরী ফাইলের মধ্যে ডুবে ছিল নির্মল। চিঠিটা পেয়ে সমস্ত অতীত তার দুঃখ লজ্জা ও অপমানের জ্বালা নিয়ে চোখের সামনে যেন সঙ্গে সঙ্গে আবার ফুটে ওঠে। সেই সঙ্গে আজ আবার অনেকদিন পরে একটি প্রিয় মুখের ছবিও মনের পাতায় জ্বল জ্বল করে ওঠে। করবী। করবী

কি আজও তাকে মনে রেখেছে, না সংবাদপত্রে তার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্মলের সমস্ত স্মৃতিই মন থেকে তার মুছে গিয়েছে। যদি তা গিয়েই থাকে সেটার জন্য কোন নালিশই তো চলবে না। আর সেটাই তো স্বাভাবিক। তবু আবার মনে হয়। কেন, কেন ভুলে যাবে রুবি তাকে। সেতো কই এখনো একটি মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেনা রুবিকে।

একটিবার, একটিবার কি সে রুবিকে গিয়ে দেখে আসতে পারেনা। একবার শুধু যদি বলে আসে : রুবি, তুমি যা জেনেছো তা সত্যি নয়। আমি মরিনি। নির্মল আজও বেঁচে আছে। না, না—তা এখন হবার নয়। সে আজ মৃত। দুনিয়ার চোখে নির্মল চৌধুরী আজ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত।

কোন্ দুঃসাহসে তবে আজ সে রুবির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে।

রুবি যদি বলে কে তুমি, তোমাকে তো আমি চিনিনা। তখন, তখন সে কি জবাব দেবে? রুবি! রুবি তার স্বপ্নের মানস প্রতিমা। নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। না, না—তার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে তাকে মলিন করবে না। দূরে আকাশের শুকতারার মতই তার স্মৃতির পাতায় থাক সে আজ নিভৃতে সেই দুঃখ নিশির শেষে প্রত্যুষের প্রতীক্ষায়। এই চোরের মত ছদ্ম ঘৃণিত জীবন যাপন—আগে এর শেষ হোক। অত্যাচারীর প্রতি সে আগে প্রতিশোধ নিক। তারপর····

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপরে 'মতিঝিল' নামে যে বিঘে দেড়েক জমির উপরে সামনে ও পিছনে বাগানওয়ালা মস্তবড় দোতলা বাড়ীটা তার মালিক হচ্ছেন পূর্ববঙ্গের এক প্রৌঢ় চিরকুমার জমিদার সন্তোষ মিত্র। ভদ্রলোকের বয়েস ঠিক যে কত তা বোঝবার উপায় নেই বলিষ্ঠ দেহ-সৌষ্ঠভ দেখলে। তবে তিনি নিজে বলেন পঞ্চাশের উপরে নাকি তাঁর বয়স।

গায়ের বর্ণ মাজা মাজা। এক মুখ দাড়ি কাঁচায় পাকায় মেশানো। মাথার বড় বড় চুলও কাঁচায় পাকায় মেশানো। প্রথম যৌবনে কি একটা দুর্ঘটনায় ডান পায়ের পক্ষাঘাতে দীর্ঘদিন ধরে ভুগেছিলেন। হাঁটবার সময় তাই ডান পাটা একটু টেনে চলেন। তাছাড়া চোখের অসুখের জন্য সর্বদা রঙীন কাচের চশমা ব্যবহার করেন। বাড়ীতে যতক্ষণ থাকেন বেশির ভাগ সময়ই, হয় লাইব্রেরী ঘরে বসে পড়াশোনা করেন, না হয় লাইব্রেরী ঘরেরই এক কোণে একটা বিরাট অর্গান আছে, সুর সাধনা করেন।

বাড়ীর পশ্চাৎ দিকে গ্যারেজে বিরাট একটা গাড়ি আছে এবং একজন বৃদ্ধ ড্রাইভারও আছে। বেলা দশটা নাগাদ ও রাত্রে একবার করে বাইরে যান। সর্বদা দেখাশুনা ও ফাইফরমাস খাটাবার জন্য একটা নেপালী ভৃত্য আছে: রণবাহাদুর থাপা। আর বাড়ী প্রহরার জন্য জনা দুই শিখ দারোয়ান আছে। ভদ্রলোক দেখা সাক্ষাৎ বড় একটা কারো সঙ্গেই করেননা—বিশেষ করে আগে

থাকতে এ্যাপয়েন্টমেন্ট না করা থাকলে। বেশী দিন নয় মাত্র বৎসর দুয়েক হবে সন্তোষ মিত্র 'মতিঝিল' কিনে ওখানে এসে বসবাস করছেন। সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না করলে কি হবে, মধ্যে মধ্যে মতিঝিল বিশেষ এক শ্রেণীর আগন্তুকদের বহুকণ্ঠের কলরবে সচকিত হয়ে ওঠে। এবং তাদের মধ্যে সকলেই কলেজের ছাত্র-ছাত্রী।

সেদিন বৈকালের দিকে সন্তোষ মিত্র একাকী তার বিরাট লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে বসে একটা মোটা বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছেন ও মধ্যে মধ্যে দরজার পর্দাটার দিকে তাকাচ্ছেন, পর্দার নিচে একজোড়া পরিচিত পায়ের শুভাগমনের প্রতীক্ষায়। হাতে বই-ধরা থাকলেও কোন বিশেষ একজনের আগমনের প্রতীক্ষায় যে সন্তোষ মিত্র বেশ একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছেন সেটা তাঁর চোখ মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

সাড়ে পাঁচটা নাগাদ পর্দার ওপাশে পদক্ষেপ শোনা গেল ও তার একটু পরেই স্যান্ডেল পরিহিত একজোড়া পা দেখা গেল।

ভিতরে আসতে পারি সন্তোষদা ?

আরে কে করবী, এসো, এসো—সাগ্রহে আহ্বান জানালেন সন্তোষ মিত্র।

করবী এসে ঘরে প্রবেশ করলো। এই ক'দিনে করবীর চেহারা যেন আরো বিষণ্ণ মনে হয়।

বোস, বোস—

একটা সোফার পরে বসতে বসতে করবী ক্লান্ত কণ্ঠে, বলে মণির সঙ্গে সেদিন রাস্তায় দেখা, সে বলছিল আপনি নাকি আমাকে বিশেষ কি কারণে একবার দেখা করতে বলেছেন।

হ্যাঁ, দেখা করতে বলেছিলাম। পর পর চার পাঁচটা সম্মিলনীতে তুমি এলেই না।

ভাল লাগে না তাই আসিনা।—মৃদু কণ্ঠে বলে করবী।

একটা কথা বলবো করবী ?

করবী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সন্তোষ মিত্রের মুখের দিকে তাকালো।

মিথ্যে নিজেকে আর এমনি করে কষ্ট দিয়ে লাভ কি বল! মৃত্যুর পরপার থেকে তো আর সে ফিরে আসবে না!

করবীর চোখের কোল দুটি অশ্রুতে ছল ছল করে ওঠে।

সন্তোষ মিত্র বলতে থাকেন, তাছাড়া আমার তো মনে হয় এক দিক দিয়ে ভালই হয়েছে। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। কারণ হয় তাকে সারাটা জীবন ধরে কারাগারে থাকতে হতো না হয় ফাঁসীই যেতে হতো। তাছাড়া তুমি—হঠাৎ কণ্ঠের স্বর বদলে সন্তোষ মিত্র বলতে থাকেন, তুমিই বা কেন আজো তাকে মনে করে রাখবে! যে নরহত্যার কলঙ্কে এমনি করে তোমার ভালবাসাকে অপমান করে—

না, না—সহসা যেন আর্ত করুণ কণ্ঠে সন্তোষ মিত্রকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে করবী, বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি না সন্তোষদা, নির্মল কোনদিন কাউকে হত্যা করতে পারে। সে নিষ্পাপ, নির্দোষ।

বেশ। তাই যদি হয় তাহলেও তো আজ সে সব কিছুর বাইরে চলে গেছে। তবে আজ আর মিথ্যা কেন তার স্মৃতিকে নিয়ে অশ্রুমোচন করবে।

পারবো না, কোনদিনই তাকে আমি ভুলতে পারবো না সন্তোষদা! অসম্ভব। আমার পক্ষে তা অসম্ভব! দুহাতের মধ্যে মুখ ঢেকে করবী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

ছিঃ করবী! তুমি বুদ্ধিমতী! এমনি করে শোক করা তোমার সাজে না। তোমার সমস্ত জীবনটাই যে এখনো সামনে পড়ে। একবার ভেবে দেখ তো এভাবে নিজেকে বঞ্চিত করে কি তুমি তোমার আত্মাকেই নিগ্রহ করছো না।

ও সব কথা থাক সন্তোষদা! আমি জানি তাকে এ জীবনে কোন দিনই ভুলতে পারবো না।

তা বেশ! বেশ—কিন্তু সোসাইটি একেবারে ছেড়ে দিলে কেন? সামনের বুধবার সন্ধ্যায় এখানে একটা গ্যাদারিং আছে, এসো!

চেষ্টা করবো।

চেষ্টা করবো নয়। এসো—

আমি তাহলে আজ উঠি সন্তোষদা?

এসো। হ্যাঁ ভাল কথা, সুহাস বলছিল তার কি বই কেনার দরকার, এই টাকাটা তাকে দিয়ে দিতে পারবে? সে তো তোমাদের স্কুলেই চাকরি করে—বলতে বলতে একশ টাকার একটা নোট পকেট থেকে বের করে এগিয়ে দিলেন সন্তোষ মিত্র করবীর দিকে।

পারবো।

টাকাটা নিয়ে নিজের হাত ব্যাগে রেখে নিঃশব্দে করবী ঘর থেকে বের হয়ে গেল। বাইরের বারান্দায় পদশব্দ মিলিয়ে যাবার পর সন্তোষ ধীরে ধীরে উঠে, পা টেনে টেনে গিয়ে অর্গানের সামনে টুলটার ওপরে বসে অর্গানের ডালা খুলে তার রিডগুলোয় হাত রেখে বাজাতে শুরু করলেন।

রাত বারটা বেজে গিয়েছে। কিন্তু করবীর চোখে ঘুম ছিল না। বিনিদ্র অবস্থায় সে তার নিজের শয়ন কক্ষের মধ্যে কেবলই পায়চারি করছিল। করবীর বাবা রমেন্দ্রবাবু দিন কয়েকের জন্য কি একটা কাজে যেন বেনারস গিয়েছেন। অনিমেষবাবুরও আজ দিন দুই কোন সংবাদ নেই। মধ্যে মধ্যে যেমন তিনি দু'চার দিনের মত ডুব দেন, তেমনই ডুব দিয়েছেন। বাড়ীতে সে ও ঝি চাকররাই আছে। কিন্তু অত রাত্রে তারাও নিচের ঘরে ঘুমিয়ে। বাড়ীটার বাইরের অংশেরও গোলমাল থেমে গিয়েছে।

করবী এক সময় গঙ্গার দিকের খোলা জানালাটার সামনে এসে দাঁড়ালো। জানালা থেকে গঙ্গার অনেকটা প্রায় দৃষ্টিগোচর হয়। গঙ্গার মৃদু তরঙ্গ কল্লোল, নিঝুম রাতে যেন দূরাগত অস্পষ্ট সঙ্গীতধ্বনির মতই মনে হয়। অন্ধকার রাত্রি। অগণিত নক্ষত্রখচিত কালো আকাশ যেন প্রিয়া লাগি সহস্র চক্ষু মেলে নিশি জাগছে। মৃদু নক্ষত্রালোকে যেন গঙ্গাবক্ষে চলেছে আলো-ছায়ার একটা লুকোচুরি। বাঁধানো ঘাটের পাশে বিরাট শাখা পত্রবহুল বটগাছটা নিশীথের চোরা হাওয়ায় সিপ্ সিপ্ শব্দ করছে।

নির্মল কতদূরে তুমি জান না! কেন, কেন তুমি এমনি করে নিজেকে শেষ করে দিলে! এতটুকু ধৈর্য তুমি কেন ধরতে পারলে না।

সহসা দরজার ভেজানো কপাট দুটো মৃদু একটা শব্দ তুলে খুলে গেল।

কে?—চকিতে ফিরে দাঁড়ালো করবী।

মনের অস্থিরতায় ঘরের দরজাটা পর্যন্ত সে বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল তাও মনে নেই। ভয়ে বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করছে তখন করবীর। দরজার ঠিক উপরে অন্ধকারে অস্পষ্ট কে একজন দাঁড়িয়ে।

কে! কে ওখানে!—গলা দিয়ে যেন করবীর স্বর বের হতে চায় না।

ভয় পাবেন না করবীদেবী।

কে?...বিস্ময়ে চমকে ওঠে করবী, এ যেন পরিচিত কণ্ঠস্বর। আবার জিজ্ঞাসা করে করবী, কে? কে?

আমাকে আপনি চিনবেন না করবীদেবী। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আমি আপনার কোন ক্ষতি করতে আসিনি। আপনার সঙ্গে যে দেখা করতে পারবো তা ভাবিনি, সৌভাগ্য যে আপনার ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল, নচেৎ হয়ত নিরাশ হয়েই আমাকে ফিরে যেতে হতো। কিন্তু যাক্ দেখা যখন সৌভাগ্যক্রমে হয়েই গেল তখন আপনার সঙ্গে যে জন্য আমার এখানে এত রাত্রে ভাগ্যের 'পরে নির্ভর করে আসা, সে কথাটা জানিয়ে যাই। আপনি নির্মল চৌধুরীকে চিনতেন?

নির্মল! কিন্তু কে, কে আপনি?

বলতে পারেন সে আর আমি অভিন্ন হৃদয়। আর তাতেই আমি জানি, আপনার প্রতি তার কি গভীর ভালবাসাই না ছিল। কিন্তু হতভাগ্য সে—নইলে খুনের কলঙ্কের মধ্যে সে জড়িয়ে পড়বে কেন! যাক্ সে কথা, শুধু একটা কথা আমি জানতে এসেছি, সে হতভাগ্যের স্মৃতি কি আজও আপনার মনে আছে?

যদি থাকেই, তাতেই বা আজ আর তাঁর কি! সেতো আজ সব কিছুরই শেষ মীমাংসা করে দিয়ে গিয়েছে।

করবীদেবী, যদি বলি নির্মল আজো বেঁচেই আছে—

কি! কি বললেন—আর্তকণ্ঠে যেন করবী অস্ফুট একটা চিৎকার করে ওঠে।

হ্যাঁ, করবীদেবী, নির্মল সত্যিই আজো বেঁচে আছে।

বেঁচে আছে! নির্মল আজো বেঁচে আছে! সত্যি, সত্যি বলছেন? উৎকণ্ঠার আবেগে করবীর কণ্ঠস্বর যেন ভেঙ্গে পড়ে।

হ্যাঁ, করবীদেবী। সে বেঁচে আছে। সেই সংবাদটুকু আপনাকে দেবার জন্যই সে আজ আমাকে এখানে পাঠিয়েছে—

বেঁচে আছে। কিন্তু কোথায়, কোথায় সে?

ব্যস্ত হবেন না করবীদেবী, আপনার কথা গিয়ে তার কাছে আমি বলবো! কিন্তু যতদিন না যে কলঙ্কের সঙ্গে আজ সে জড়িত, তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে, ততদিন তার অজ্ঞাতবাসই চলবে। যতদিন না সেই শয়তানের মুখোস খুলে দিয়ে নিজেকে সে আজকের তার এই কলঙ্ক থেকে মুক্ত করতে পারে, ততদিন সে আসবে না আপনার কাছে, তাই সে আমাকে জানিয়ে যেতে বলেছে শুধু আপনাকে! তাকে, যেন ভুল বুঝবেন না।

না, না—তাকে বলবেন, আমি, আমি—তাকে ভুল বুঝিনি, আর আমি, আমি—সেই দিনেরই অপেক্ষা করবো। কান্নায় করবীর চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়, গলার স্বর বুজে আসে।

করবী নিজেকে সামলে নেবার আগেই কিন্তু আগন্তুক কক্ষ ত্যাগ করেছে। এবং তারও কিছুক্ষণ পরে করবী ঘরের আলোটা সুইচ টিপে জ্বালাতেই মেঝের 'পরে একটা জিনিষ তার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করলো। কৌতূহলে এগিয়ে গিয়ে তুলে নিয়ে দেখে একটা রুমাল।

রুমাল! এ রুমাল এখানে এলো কি করে? তবে কি ক্ষণকাল পূর্বের সেই আগন্তুকই ভুলক্রমে রুমালটা এখানে ফেলে গিয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই রুমালে এক কোণে সবুজ সুতায় লেখা একটা নাম তার চোখে পড়তেই যেন চমকে ওঠে।

নির্মল!

এ কি! এ তো তারই হাতের সবুজ সুতো দিয়ে নির্মলের নামের আদ্যাক্ষর 'এন্' লিখে দেওয়া রুমাল! ছটা রুমালে সবুজ সুতো দিয়ে নাম তুলে গতবার জন্মদিনে নির্মলকে সে প্রেজেণ্ট করেছিল। তবে। তবে কি! নির্মল! হ্যাঁ, তাই গলার স্বর এতো পরিচিত মনে হয়েছিল তার!

নির্মল! নির্মল—তুমি এলে তবু পরিচয় দিলে না তোমার রুবির কাছে। তোমার রুবিকে আজও তুমি চিনতে পারলে না নির্মল! মুক্তার মত অশ্রুর ফোঁটাগুলো করবীর চোখের কোলে, গণ্ড ও চিবুককে প্লাবিত করে নিঃশব্দে ঝরতে থাকে।

॥ তের ॥

ময়না তদন্তের দ্বারা সে রাত্রে বেবীর গাড়ির ড্রাইভার রতনলালের মৃত্যুর কারণটা জানা গিয়েছে। কার্বণ মনোকসাইড পয়জনিং। থানা অফিসার সুশীল সোমের থানার নিজস্ব অফিস ঘরে দুজনে দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসে সুব্রত ও সুশীল সোমের মধ্যে সেই আলোচনাই চলছিল।

সুব্রত বলছিল, সত্যি হত্যাকারী এবারে হত্যা করবার জন্য যে পন্থা বেছে নিয়েছিল, বলতে বাধ্য হচ্ছি সেটা শুধু অদ্ভুতই নয় বিস্ময়কর।

কিন্তু এখনো আমি বুঝতে পারছি না সুব্রতবাবু, লোকটা কার্বন মনোকসাইড পয়জনিং-এ মরলো কি করে?

সে কথাই তো বলছি। ময়না তদন্তের রিপোর্ট আপনার মুখ থেকে শোনবার পর যা আমার মনে হয়েছে তা হচ্ছে, আসলে হত্যাকারীর লক্ষ্য ছিল সে রাত্রে কিন্তু ড্রাইভার রতনলাল নয়।

তবে?

তার লক্ষ্য ছিল বেবী ঘোষ।

বলেন কি!

হ্যাঁ। রতনলালের মৃত্যুটা একটা পিওর এ্যাক্সিডেণ্টও বলতে পারেন। হত্যাকারী যেই হোক্, সে জানতো খুব ভাল করেই যে বেবী সাধারণতঃ নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে থাকে। আর সদা সর্বদা সে ঐ গাড়িটাই ব্যবহার করে থাকে। রতনলালের মৃত্যু কপালে নেহাৎ ছিল বলেই বোধহয় সেদিন বেবী নিজে না গাড়ি চালিয়ে ড্রাইভার রতনলালকে সঙ্গে নিয়েছিল ড্রাইভ করবার জন্য। যাহোক বেবী ঐ গাড়িটাই ব্যবহার করে ও নিজে সর্বদা ড্রাইভ করে জেনেই হত্যাকারী বেবীর বাড়ীর কোন চাকর বাকরকে টাকা খাইয়ে হাত করে কোন এক ফাঁকে গাড়ির মধ্যে কৌশলে ঐ ব্যবস্থা করে রেখেছিল যাতে করে এক সময় না এক সময় সহজেই বেবীকে শেষ করে ফেলা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, হত্যাকারী আরো ক্যাল্কুলেশন করেই ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। এখন বর্ষাকাল, প্রায়ই বৃষ্টি হয়। হঠাৎ রাস্তায় বৃষ্টি নামলে আরোহী বাধ্য হবে গাড়ির দরজার সব কাঁচ তুলে দিতে, যার ফলে বন্ধ গাড়ির মধ্যে ক্রমশঃ একজস্ট্ পাইপ থেকে বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস এসে জড়ো হয়ে আরোহীকে ধীরে ধীরে অচেতন করে ফেলে হয় তাঁর মৃত্যু ঘটাবে না হয় বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে অচেতন অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে এ্যাকসিডেণ্ট ঘটাবে ও আপনা থেকেই মৃত্যু হবে চালকের।

সত্যিই আপনি তাই মনে করেন মিঃ রায়? সুশীল সোম প্রশ্ন করেন।

হ্যাঁ। এ সম্পর্কে অনুমান আমার এতটুকুও মিথ্যে নয়। এবং শুধু তাই নয়, বেবীকে ঐভাবে মারবার প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে এটাই আবার নতুন করে প্রমাণিত হচ্ছে যে, নরেন্দ্রনাথ, শ্রীনাথ কর ও রতনলালের হত্যাকারী একই ব্যক্তি।

একই ব্যক্তি!

এখনো সেটা বুঝতে পারলেন না সুশীলবাবু! আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন, পরপর এই হত্যাগুলো একই জায়গা বা বলতে পারেন একই মাটি থেকে রস শোষন করছে।

তাহলে আপনি বলতে চান সুব্রতবাবু—

বাধা দেয় সুব্রত। বলে, বলতে চাই আপনারা নির্মল চৌধুরীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে পূর্ণচ্ছেদ টেনে বসে আছেন, এই তিন তিনটি হত্যার ব্যাপারে, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ টানলে চলবে না। নতুন করে আবার আপনাকে ঐ হত্যা রহস্যের মীমাংসায় অগ্রসর হতে হবে।

কিন্তু নির্মল চৌধুরীর মৃত্যুটা তাহলে—

তার মৃত্যু হয়েছে সেটাই বা অবিসংবাদী ভাবে ধরে নিচ্ছেন কেন?

এখনো আপনি তাই বলতে চান সুব্রতবাবু!

নিশ্চয়ই, বিকৃত দগ্ধদেহ যেটা আমরা জেলের মধ্যে পেয়েছি, নির্মল চৌধুরী বলে তাকে সনাক্ত করবার একটি মাত্রই তো সূত্র আমাদের হাতে যে, তার দেহে নির্মল চৌধুরীর পোষাকটা ছিল, আর তো কোন সূত্রই আমরা পাইনি সুশীলবাবু।

তা অবিশ্যি ঠিক, কিন্তু—

তা ছাড়া আরো একটা কথা ভাববার আছে আমাদের। নির্মল চৌধুরী অমন ভাবে পুড়ে মরলোই বা কেন? আর বজলুল রহমানের ঘরেই বা পুড়ে মরতে গেল কেন? তার সেলের তালা ভাঙ্গা ছিল ঠিকই কিন্তু কি কারণে সে রহমানের ঘরে আসতে যাবে। এবং রহমানই বা নিরুদ্দেশ হলো কেন? সব কিছু ভাবতে গেলে সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন একটু গোলমেলে ঠেকে না কি আপনিই বলুন।

তা অবিশ্যি মিথ্যে নয়।—মৃদু কণ্ঠে জবাব দেন সুশীল সোম।

তাহলেই ভেবে দেখুন আমরা ঐ ব্যাপারে পূর্ণচ্ছেদ টানতে পারি না একমাত্র নির্মল চৌধুরীর মৃত্যু হয়েছে বলেই।

সুশীল সোম অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, তাহলে?

আমার আজ রাত্রে বিনয়েন্দ্রবাবুর গৃহে ডিনারের নিমন্ত্রণ আছে, কাল সকালের দিকে আমার বাসায় একবার আসুন না। বিনয়েন্দ্রবাবুর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে যদি কোন নতুন সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

তা কি সম্ভব?

দেখাই যাক না। হ্যাঁ, ভাল কথা, আপনাকে বি. টি. রোডে, 'মতিঝিলে' সন্তোষ মিত্রের সংবাদ নিতে বলেছিলাম, নিয়েছিলেন ?

না, এখনো নিয়ে উঠতে পারিনি।

সংবাদটা নেবেন তাঁর। কেন তাঁর গৃহে মধ্যে মধ্যে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মিলন হয়।

সেতো শুনেছি গরীব দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের তিনি নাকি সাহায্য করেন।

তা করেন কিন্তু তাঁর দানের হাতটা কেবল বিশেষ একশ্রেণীর তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেই প্রসারিত কেন এবং অন্যান্য ব্যাপারেই বা সেটা অত নির্দয় ও সংকুচিত হয় কেন ? তাছাড়া একটা কথা তো আপনাকে আমি বলেছি সেদিন, করবীদেবী ও বেবীরও সেখানে যাতায়াত আছে। তাদের দুজনার একজনও তো ঠিক দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীর পর্যায়ে পড়ে না। যাক আজ উঠি।

অতঃপর সুব্রত নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

চিঠি দিয়ে বেবী তার কাকার হয়ে সুব্রতকে সেদিন রাত্রে ডিনারের নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সেদিনকার এ্যাকসিডেণ্টের ব্যাপারে বিনয়েন্দ্রবাবু নাকি সুব্রতর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ। আলাপ করতে চান সুব্রতর সঙ্গে। সুব্রতও সানন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল। ধনীগৃহে ডিনারের আমন্ত্রণ, সুব্রত একটু বিশেষভাবেই সাজগোজ করেছিল। দামী গরদের সুটে সত্যিই সুব্রতকে মানিয়েছিল চমৎকার।

সুব্রতর গাড়ি এসে রাত আটটা নাগাদ বিনয়েন্দ্র ঘোষের বালীগঞ্জের বাড়ীর করিডোরে দাঁড়াতেই সঙ্গে সঙ্গে করিডোরে অপেক্ষামান বেবীর সাদর মিষ্টি আহ্বান কানে এলো : গুড ইভনিং।

করিডোরের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয়, গাড়ি থেকে নেমে সম্মুখে দণ্ডায়মান বেবীর দিকে তাকিয়ে সুব্রত যেন মুগ্ধ হয়ে যায়। সাদা রুপালী পাড় বসান দামী ইটালীয়ান জর্জেটে বেবীকে মানিয়েছিল ভারি চমৎকার। সিংগিল করা চুল কাঁধে, পিঠে ও বুকের উপরে যেন রেশমের মত গুচ্ছে গুচ্ছে এলিয়ে আছে।

চলুন, কাকা আপনার জন্য সন্ধ্যা থেকেই বাড়ীতে অপেক্ষা করছেন। আজ বের হননি পর্যন্ত—

বেবীর পাশে পাশে চলতে চলতে সুব্রত প্রশ্ন করে, কেন, আপনার কাকা কি এসময় বাড়ীতে থাকেন না ?

কাকা যে বাড়ীতে কখন থাকেন আর কখন থাকেন না, তা তিনিই জানেন। এই আছেন আবার এই নেই—

বাড়ীতে বুঝি বিশেষ থাকেন না ?

তাই তো দেখি।

হলঘর থেকে বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠে, বেবীকে অনুসরণ করে সুব্রত নিচের হলঘরের মত অনুরূপ একটি হলঘরে এসে প্রবেশ করলো। ধনীগৃহের ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যে চারিদিক যেন ঝক্ ঝক্ করছে। মেঝেয় দামী কার্পেট। ভেলভেটের কুশন গদীমোড়া সব সোফা। দেওয়ালে দেওয়ালে সব বিখ্যাত চিত্রকরদের আঁকা বিখ্যাত সব ল্যান্ডস্কেপ। অদৃশ্য বাতিদান থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলোর বন্যা।

একটা সোফা দেখিয়ে বেবী বললে, বসুন, কাকাকে ডেকে আনি—

সুব্রতকে বসিয়ে বেবী ঘরের অন্য এক দ্বারপথের পর্দা তুলে অন্দরে অদৃশ্য হলো। কিন্তু মিনিট কয়েক পরে বেবী আবার একাই ফিরে এসে বললো, চলুন কাকার লাইব্রেরী ঘরে, কাকা সেখানেই নিয়ে যেতে বললেন।

বেবীকে অনুসরণ করে এবারে যে ঘরটির মধ্যে সুব্রত এসে প্রবেশ করলো সেটাও আকারে নেহাৎ ছোট নয়। এ ঘরেরও মেঝেতে দামী কার্পেট বিছানো। চারপাশে আলমারি ভর্তি সব বই। মাঝখানে একটি গোল টেবিলের পরে সবুজ ঘেরাটোপ ঢাকা একটি টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। চারপাশে তার খানকয়েক আরাম কেদারা। তারই একটায় বসে বিনয়েন্দ্র একটা মোটা বই পড়ছিলেন।

ছোটকা—

বেবীর ডাকে মুখ তুললেন বিনয়েন্দ্র।

ইতিপূর্বে একত্র থাকাকালীন সময়ে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সুব্রতর আলাপ হবার সুযোগ হলেও বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ বা আলাপ পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি।

আসুন, আসুন—নমস্কার!—সাদর আহ্বান জানালেন বিনয়েন্দ্র।

সুব্রত প্রত্যুত্তরে দুহাত তুলে নমস্কার জানিয়ে সামনের একটা চেয়ারে উপবেশন করলেন। হাতের বিরাট মোটা বইটা একপাশে নামিয়ে রেখে বিনয়েন্দ্র বললেন, বেবীর মুখে আপনার কথা শোনা অবধি আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য বারবার বেবীকে বলেছি। সত্যি, সে রাত্রে বেবীকে যেভাবে সাহায্য করেছেন, কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো।

না, না—এতে ধন্যবাদের কি আছে। মানুষমাত্রেরই যেটুকু কর্তব্য, তার বেশী কি আর করেছি বলুন মিঃ ঘোষ।

কি বলছেন সুব্রতবাবু, কর্তব্য আজকালকার দিনে ক'জন করে বলুন তো।

কথা বলতে বলতেই সুব্রত আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল বিনয়েন্দ্রকে। চমৎকার দেহ সৌষ্ঠভ। বয়স চল্লিশের উর্ধ্বে হলেও দেহের কোথাও এতটুকু যেন ভাঙ্গন ধরেনি। মাথার সম্মুখভাগে চকচকে মসৃণ একখানি টাক। প্রশস্ত নিভাঁজ কপাল। রগের দুপাশের চুলে মধ্যে মধ্যে

রূপালী ইশারা সুস্পষ্ট। পাতলা ভ্রূ যুগল। নাকটা একটু চ্যাপ্টা। নাকের একপাশে একটা ক্ষতচিহ্ন বর্তমান। ছোট ছোট গোল গোল চক্ষু, দৃষ্টিতে সদাজাগ্রত শিকারীর তীক্ষ্ণতা যেন। পরিপাটি ঝকঝকে ছোট ছোট দুপাটি দাঁত। দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো, গাত্রবর্ণ মাজা মাজা। খুব পরিষ্কারও নয় আবার কালোও নয়। কিন্তু সমস্ত চেহারা ও পোষাকের মধ্যে যেন একটা উদ্ধত রুক্ষ দাম্ভিকতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। সিল্কের ঢোলা পায়জামা ও কিমানো গায়ে। পায়ে ঘাসের চপ্পল।

মিঃ রায়, এনি কোল্ড ড্রিঙ্ক। অর ইফ ইউ লাইক এনি লিকার ইউ কেন হ্যাভ—

না, না-মিঃ ঘোষ। অন্য কিছুতে আমার অভ্যাস নেই, বরং—

কিযেনকে বল্ তো বেবী—

আমি দেখছি—বেবী দ্রুতপদে ভিতরে অদৃশ্য হলো।

পকেট থেকে একটা সোনার সিগ্রেট কেস্ বের করে প্রথমেই সুব্রতর দিকে এগিয়ে দিলেন কেস্‌টা বিনয়েন্দ্র, সিগ্রেট—

নো, থ্যাঙ্কস্!

মৃদু হেসে বিনয়েন্দ্র এবার নিজে একটা সিগ্রেটে অগ্নিসংযোগ করলেন। মুহূর্তে প্রজ্জ্বলিত সিগ্রেটের ধোঁয়ার বিশেষ একটা কটু গন্ধে সুব্রত বুঝতে পারে, স্পেশ্যাল ইজিপসিয়ান ব্রাণ্ডের সিগারেট। সিগারেটে গোটা দুই টান দিয়ে খানিকটা ধূম ছাড়তে ছাড়তে মৃদু কণ্ঠে বিনয়েন্দ্র এবারে বললেন, আমার একবার আপনার সঙ্গে গিয়ে আলাপ করা অবিশ্যি কর্তব্য ছিল—

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সুব্রত বিনয়েন্দ্রর মুখের দিকে তাকায়।

হ্যাঁ, দাদার আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারে যখন আপনি সুশীল সোমের সঙ্গে ঘোষ নিবাসে এসেছিলেন, কিন্তু নানা কাজের ভিড়ে যাবো যাবো করেও যেয়ে উঠতে পারিনি। তারপর তো নির্মল চৌধুরীর মৃত্যুতে সব কিছুরই মীমাংসা হয়ে গেল—

কথাটা শেষ হলো না বিনয়েন্দ্রর। বেয়ারা এসে ঘরে প্রবেশ করে বললে, বিকাশবাবু এসেছেন।

বিকাশ এসেছে। যা পাঠিয়ে দে।

বেয়ারা চলে গেল।

॥ চৌদ্দ ॥

সুব্রত কোনরূপ প্রশ্ন না করা সত্ত্বেও বিনয়েন্দ্রই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন, এ নাইস ইয়ং ম্যান। মাদ্রাজ থেকে আমার দাদারই এক বন্ধুর সুপারিশ-চিঠি

নিয়ে এসেছিল, আমি নির্মলের পোস্টেই ওকে এ্যাপয়েণ্ট করেছি।

ও।

অদ্ভুত এবিলিটিস্ ছেলেটির। দুদিনেই যেন এতবড় অফিসটার সব কিছু একেবারে নখদর্পণে নিয়ে এসেছে। অবিশ্যি শুনেছি নির্মল ছেলেটিও নাকি ঐ রকমই করিৎকর্মা ছিল, কিন্তু দাদা মৃত্যুর ঠিক কয়েকদিন আগেই ডিসাইড করে ফেলেছিল শুনলাম, নির্মলকে আর চাকরিতে রাখবে না। সেদিক দিয়ে দাদা এই ছেলেটিকে পেলে বোধহয় লুফেই নিতেন।

হ্যাঁ, আমিও শুনেছি নির্মল চৌধুরীকে চাকরি থেকে ডিসচার্জ করবেন নরেন্দ্রবাবু স্থির করে রেখেছিলেন। কিন্তু জানেন কিছু সে কারণটা কি?

না, অফিসের লোকেরাও বলতে পারেনি। তবে হয়ত অফিস ম্যানেজার শ্রীনাথবাবু বেঁচে থাকলে বলতে পারতেন ব্যাপারটা। তা তিনিও তো আজ নাগালের বাইরে।

ভৃত্যের হাতে ট্রেতে করে সুদৃশ্য জাপানী কাঁচের পাত্রে শীতল অরেঞ্জ স্কোয়াশ নিয়ে বেবী এসে ঘরে ঢুকলো ঐসময়। ভৃত্যের হস্তধৃত ট্রের ওপর থেকে বেবীই নিজে একটি গ্লাস তুলে সুব্রতর দিকে এগিয়ে দিল। সুব্রত গ্লাসটা হাতে নেয়।

ছোটকাকা তুমি?

না মা।—আমাকে বরং একটা বীয়ার দিতে বলো।

ভৃত্যের চোখের দিকে তাকাতেই সে ট্রেটা নিয়ে বের হয়ে গেল ঘর থেকে। আর ঠিক পর মুহূর্তে দরজার বাইরে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল ও একটি চাপা পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল, ভিতরে আসতে পারি স্যার?

কে, বিকাশবাবু, আসুন আসুন—

দামী সুট্ পরিহিত বিকাশ এসে ঘরে প্রবেশ করলো।

লেট্ মি ইন্ট্রোডিউস। বিকাশ রায়—আমাদের অফিসের নবনিযুক্ত সেক্রেটারী, আর ইনি সুব্রত রায়—সত্যান্বেষী।

নমস্কার।—বিকাশ হাত তুলে নমস্কার জানালো সুব্রতকে। সুব্রতও প্রতিনমস্কার জানায়।

সুব্রত তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল বিকাশের মুখের দিকে। পরিচিত মুখ অথচ যেন মনে পড়ছে না।—অনেক সৌসাদৃশ্য আছে অথচ যেন ঠিক চেনা যাচ্ছে না। মুখের ডৌলটি, ভ্রূ, ওষ্ঠ, কয়েকটি রেখা, কথা বলবার সময় ওষ্ঠাধরের কুঞ্চনের সঙ্গে অনেকখানি যেন পরিচিত অথচ চেনা-যাচ্ছে না নিঃসংশয়ে।

আপনি আমাকে ডেকেছিলেন মিঃ ঘোষ?—বিকাশ মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, সুব্রতবাবু আপনি যদি কিছু না মনে করেন তো বিকাশবাবুর সঙ্গে অফিস সংক্রান্ত আমার কিছু জরুরী কথা ছিল—

নিশ্চয়ই। আপনি যান।—সুব্রত বলে।

বিনয়েন্দ্র ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন, বললেন, চলুন বিকাশবাবু—

ভৃত্য আবার ঐ সময় ঘরে এসে ঢুকলো ট্রের 'পরে এক গ্লাস ঠাণ্ডা বীয়ার নিয়ে বিনয়েন্দ্রর জন্য।

বেবী বলে, কাকা স্টাডিতে গেলেন, সেখানে দিয়ে আয় গিয়ে।

ভৃত্য যেতে যেতে বললে, দিদিমণি, আপনাকে কে ফোনে ডাকছে।

সুব্রতবাবু, এক মিনিটের মধ্যেই শুনে আসছি আমি।

ভৃত্যের প্রায় পিছনে পিছনেই বেবীও ঘর থেকে বের হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে এবারে একাকী সুব্রত। অলস অন্যমনস্কভাবে পাশেই চেয়ারের উপরে রক্ষিত বিনয়েন্দ্রর ফেলে যাওয়া মোটা বইটা তুলে নিল সুব্রত।

কোনান ডয়েলের রহস্য গল্পের রাজ সংস্করণ। কৌতূহলী সুব্রত বইটার পাতা উল্টাতে হঠাৎ একটা সাদা পুরু আইভরী লেটার পেপারে সবুজ কালীতে লেখা চিঠি ওর নজরে পড়লো। লেটার পেপারটার উপরে বেগুনী কালীতে এম্‌বস্‌ করা একটি বাংলা শব্দ সুব্রতর দৃষ্টিটা যেন বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

'মতিঝিল'। বাংলা অক্ষরটি হচ্ছে মতিঝিল। সঙ্গে সঙ্গে একটি বাড়ী ও তৎসংলগ্ন ইতিহাস সুব্রতর মনের পাতায় ভেসে ওঠে। সংক্ষিপ্ত দুই লাইনে বাংলায় লেখা একটি চিঠি।

অপূর্ব,

আগামী ২২শে জুলাই শনিবার চায়না হোটেলে দেখা হবে। অত্যন্ত জরুরী। রাত দশটায়।

—রুইতন।

বার বার তিনবার চিঠির লেখাগুলো পড়লো সুব্রত। চায়না হোটেল, রাত দশটায়, ২২শে জুলাই, শনিবার—রুইতন।

কিন্তু এ চিঠি এখানে কেন? এবং কেই বা ঐ অপূর্ব আর কেই বা ঐ রুইতন। দরজার ওপারে পদশব্দ শোনা গেল। তাড়াতাড়ি চিঠিটা বইয়ের মধ্যে রেখে সুব্রত বইটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে নিজের জায়গায় ঠিক হয়ে বসলো।

ঘরে এসে ঢুকলেন বিনয়েন্দ্র।—স্যরি সুব্রতবাবু, আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে—

না, না—তাতে কি হয়েছে।

আর বলেন কেন, দাদার মৃত্যুতে সব ঘাড়ে এসে পড়ায় যেন একেবারে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। নিজের কোনদিনই ঐ সব ব্যবসা ট্যাবসার দিকে ঝোঁক ছিল না। তাছাড়া বিয়ে থা করিনি, একা মানুষ। কিন্তু ঐ বেবী মেয়েটার জন্যই এ বয়েসে সব ঝামেলা নিয়ে থাকতে হচ্ছে।

শুনলাম আপনার দাদার বিজনেসও আপনাদের বিজনেসের সঙ্গে এ্যামালগেমেটেড হয়ে যাচ্ছে খুব শীঘ্র।

হ্যাঁ, দাদার ছেলেও আবার বেবীর এক কাঠি উপরে যায়। এসে বললে, ছোটকা, যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। আপনি যদি এখন ব্যবসা না দেখেন তো আমি সব বিক্রী করে দেবো।

সুব্রত প্রত্যুত্তরে কোন কথাই বলে না, কেবল শুনতে থাকে নিঃশব্দে।

কিন্তু আপনিই বলুন তো সুব্রতবাবু, সে কি একটা কথার কথা হলো। বাবার এত কষ্টে গড়ে তোলা বিজনেস সব বিক্রী হয়ে যাবে আমি বেঁচে থাকতে, দশজনে শুনলেই বা কি বলবে!

তাতো বটেই।

বলুন। তাই কি আর করি এখন, সব ঝক্কিই আমায় নিতে হয়েছে। নিজের না হয় বিয়ে হয়নি, ছেলেমেয়ে নেই, কিন্তু ওরাই তো আমার ছেলেমেয়ে।....

বেবী এসে ঐ সময় আবার ঘরে প্রবেশ করলো।

এই যে বেবী, দেখতো ডিনার রেডি কি না?

হ্যাঁ, ছোটকা—

তবে চলুন ওঠা যাক সুব্রতবাবু!

চলুন।

সকলে আপাততঃ পাশের ঘরে গিয়ে ডিনার টেবিলে বসলো।

॥ পনের ॥

রাত তখন প্রায় পৌনে এগারটা, আহারাদির পর আরো কিছুক্ষণ গল্প করে সুব্রত সে রাত্রের মত বিনয়েন্দ্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, শুভরাত্রি জানিয়ে নিচে নেমে এলো। বেবীও সঙ্গে সঙ্গে এলো তাকে গাড়িতে তুলে দিতে।

ভারি চমৎকার কাটলো আজকের কয়েকটি ঘণ্টা মিস্ ঘোষ আপনাদের এখানে।—সুব্রত মৃদু কণ্ঠে বলে।

সেটা বুঝি একা আপনারই, আমাদেরও তো!—মৃদু কণ্ঠে বেবী জবাব দেয়।—তাই বলছিলাম আসাটা যেন এখানেই শেষ না হয়ে যায় মিঃ রায়।

সুব্রত প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসে।

গাড়ির দরজার হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে খুলেও সুব্রত হঠাৎ ঘুরে বেবীর মুখের দকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে ডাকল, মিস্ ঘোষ।

বলুন।

যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ভাবছিলাম।

বলুন না।

মতিঝিল বলে একটা বাড়ীর নাম কখনো শুনেছেন ?

হ্যাঁ। বি. টি. রোডে, সন্তোষ মিত্র নামে এক ভদ্রলোকের বাড়ী। সেখানে দুবার গিয়েছিও, কিন্তু—

কিন্তু কি ?

মৃদু হেসে বেবী বলে, দুর্ভাগ্য আমার দ্যাট্ ফেমাস্ সন্তোষবাবুর সঙ্গে দুবারের একবারও দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। দুবারই তিনি বাইরে ছিলেন।

কি ব্যাপারে গিয়েছিলেন। বেড়াতে ?

না ঠিক তা নয়, ছাত্র-ছাত্রীদের একটা সম্মিলনে গিয়েছিলাম।

ও। আচ্ছা, আর একটা কথা, অপূর্ব বলে কারো সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে ?

না। কই মনে পড়ছে না তো।

আর 'রুইতন' নামটা কখনো শুনেছেন ?

রুইতন! না—কিন্তু হঠাৎ এসব জিজ্ঞাসা করছেন কেন সুব্রতবাবু ?

এমনিই। হ্যাঁ, ভাল কথা, আমার সেদিনকার সতর্ক বাণীগুলো আপনার মনে আছে তো ?

আছে। কিন্তু সত্যিই বলুন তো সুব্রতবাবু, সে রকম কোন আশঙ্কার কারণ আমার জীবনের 'পরে আছে বলে আপনি বিশ্বাস করেন ?

করি। আর করি বলেই আপনাকে সাবধান করেছি মিস্ ঘোষ। আচ্ছা এবারে তাহলে চলি।

সুব্রত গাড়িতে উঠে বসে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিল।

গুড্ নাইট।

সুব্রতকে বিদায় দিয়ে বেবী দোতালায় তার নিজের ঘরে এসে ঢুকলো। এবং সুইচ টিপে আলোটা জ্বালাল।

বেশ প্রশস্ত ঘরখানি। ঘরের দেওয়াল সবুজ রংয়ে ডিস্টেম্পার করা। মেঝেতে কোন কার্পেট নেই। ঠাণ্ডা মেঝেই বেবী বেশী পছন্দ করে। ঘরের দক্ষিণ দেওয়াল ঘেঁষে একটা বড় আয়না বসানো আলমারি। তারই পাশে সুদৃশ্য ড্রেসিং টেবিল।

টেবিলের 'পরে নানাবিধ সব মূল্যবান প্রসাধন সামগ্রী সাজানো। একপাশে সেই ড্রেসিং টেবিলের 'পরেই কাচের ফ্লাওয়ার ভাস এক থোকা রজনীগন্ধা। দামী সিংগল বেডে শয্যা বিস্তৃত। উপরে বিছানো একটি লক্ষ্ণৌর বেড কভার।

বেবী তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিক একবার দেখে নিয়ে ঘরের দরজার অর্গল তুলে দিলে। দামী শাড়ি ছেড়ে সাধারণ একটা পাতলা তাঁতের শাড়ি পরলো। ঘরের উজ্জ্বল আলোটা নিভিয়ে দিয়ে কম পাওয়ারের নীল আলোটা জেবলে দিল। ঘরের মধ্যে নেমে এলো যেন একটা স্বপ্নচ্ছায়া।

শিয়রের ধারে দেওয়ালে টাঙানো পিতার এনলার্জড কালার-পেনটিংটার সামনে এসে এবারে দাঁড়ালো বেবী।

বাবামণি, তুমি কোথায় আজ, কতদূরে। ডেকে সাড়া পাইনা তবু মনে হয় যেন সর্বক্ষণই তুমি তোমার বেবীর পাশে রয়েছো। প্রতি মুহূর্তে যেন মনে হয় তুমি আমাকে স্পর্শ করে যাও। অথচ হাত বাড়িয়ে তোমার স্পর্শ পাই না। আদর করে বেবী বলে ডাকনা।

পিতার ফটোকে প্রণাম করে বেবী এসে পালকের মত নরম শয্যায় দেহ এলিয়ে দিল।

পাশের বাড়ীর সেই ছেলেটি ছাদে বসে বাঁশী বাজাচ্ছে। বাতাসে ভেসে আসছে সেই বাঁশীর সুর। সুর বলে যেন, আমার কত গান তো এমনি করে তোমাকে প্রতি রাত্রে শুনিয়েছি, কিন্তু কখনও তো বলিনি কিছু দাও বিনিময়ে। শুধু শোনাতেই আমার আনন্দ। তুমি শোন, এর বেশী কিছু চাইনা গো চাইনা। মনের নিভৃতে কোথায় যেন ভীরু একটি কামনা বাঁশীর ঐ সুরের সঙ্গে সঙ্গে বেবীর মনে গুণগুনিয়ে ওঠে। ক্লান্ত বোজা চোখের পাতায় ঘুম কি নামছে! কিন্তু সেই ঘুমের নিভৃতে কার ঐ ছবিটি আবছা কতগুলো রেখার মত ভাসছে। উঁচু লম্বা বলিষ্ঠ গঠন। উজ্জ্বল কালো রং। বড় বড় দুটি চক্ষু। দৃঢ় সংযত ওষ্ঠপ্রান্তে সুন্দর একটি হাসি। কে! কে তুমি …

ল্যান্সডাউন রোড ধরে খানিকটা এগুবার পর সুব্রত যেন আনমনেই গাড়িটা সোজা লেকের দিকে চালিয়ে দিল। রাস্তা নির্জন বললেও অত্যুক্তি হয় না। শুধু জেগে আছে রাস্তার দু'পাশে পর পর একচক্ষু বাতিগুলো। ওদের চোখে তো ঘুম নেই। বাড়ী ফিরতে মন চায় না সুব্রতর। নিরর্থক উদ্দেশ্য-হীনভাবে গাড়ি নিয়ে লেকের চারপাশে ঘুরতে থাকে।

সামান্য দুদিনের আলাপেই যেন বেবীর প্রতি তার কি রকম একটা আকর্ষণ পড়ে গিয়েছে। আর সেদিন কিরীটির সঙ্গে আলোচনা করবার পর থেকেই সর্বদা একটি আশঙ্কা মেয়েটিকে ঘিরে যেন সুব্রতর মনে উদয় হয়েছে। নরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে পর পর ঘটনাগুলো বিচার করে দেখতে গেলে সেদিন বেবীর ড্রাইভারের কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস পয়জনিংয়ে মৃত্যু স্পষ্টই বোঝা যায় বিশেষ কোন একটি উদ্দেশ্য নিয়েই সব কিছু যেন ঘটেছে।

সেদিন কিরীটি সুব্রতকে আর একটা কথা বলেছিল। অমরেন্দ্র, নরেন্দ্র ও বিনয়েন্দ্রের বাপ মনোরঞ্জন ঘোষের যে উইল ছিল সেটা একবার যদি সম্ভব হয় তো তার বিষয়বস্তুটা ভাল করে জেনে নেবার জন্য। সুব্রত সে সম্পর্কে সুশীল সোমকে বলেওছিল যাতে করে তিনি যত শীঘ্র সম্ভব ঘোষেদের সলিসিটার রাঘব ঘোষালের সঙ্গে একটিবার দেখা করেন। এবং সুশীল বলেছিল শীঘ্রই সে দেখা করে জানবার চেষ্টা করবে।

বেবীদের ওখান থেকে সে রাত্রে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ফিরে আসা অবধি আরো নতুন একটা চিন্তা কেবলই সুব্রতর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। এবং সেটা হচ্ছে বিনয়েন্দ্রর লাইব্রেরী ঘরে বইয়ের মধ্যে দেখা সেই চিঠিটা।

অপূর্ব নামক এক ব্যক্তিবিশেষকে ২২শে জুলাই চায়না হোটেলে রাত্রে দেখা করবার জন্য কোন এক 'রুইতন' ছদ্মনামধারী ব্যক্তি নির্দেশ দিয়েছে।

আজ ১৮ই জুলাই। আর তিনদিন পরে সেই নির্দিষ্ট দিনটি ঃ ২২শে জুলাই। সাংকেতিক ছদ্মনামধারী 'রুইতন' ব্যক্তিবিশেষটির সম্পর্কে সুব্রত কোনরূপ একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত না হতে পারলেও, পত্রে বর্ণিত 'চায়না' হোটেলটি সুব্রতর অপরিচিত ছিল না। টেরেটি বাজারের পিছন দিক দিয়ে যে রাস্তাটা বের হয়ে গিয়েছে সেই রাস্তার উপরেই চায়না হোটেলটা।

হোটেলটির খুব সুখ্যাতি কোনদিনই নেই। দোতালা একটি পুরাতন বাড়ীর নিচের হলঘর ও মাঝারী সাইজের খান চারেক ঘর ঘিয়ে হোটেলটি। হোটেলটিতে চাইনিজ ও ইংলিশ দুই রকমই ডিস্ সরবরাহ হয়। এবং ডিস্গুলোর বেশ একটা সুনামও আছে। কারণ খদ্দেরের ভিড় সর্বদাই লেগে আছে। আর শুধু ডিস্ই নয়, লিকার এবং গোপনে কোকেনও নাকি বিক্রী হয় হোটেলটিতে। অভিজাত থেকে সাধারণ মধ্যবিত্ত সর্বশ্রেণীর খরিন্দারেরই ভিড় হোটেলটিতে। হোটেলটির মালিক একজন এ্যাংলো চাইনীজ। নাম লিং চিন।

ঘরের মধ্যে অন্ধকারে একাকী দাঁড়িয়ে বেহালা বাজাচ্ছিল অনিমেষ।

রাত্রি দশটা হবে তখন। বন্ধ দরজার গায়ে মৃদু টোকা পড়ল।

কে?—বেহালা থামিয়ে প্রশ্ন করে অনিমেষ।

বাইরে থেকে ভৃত্যের গলা শোনা গেল, বাবু আমি।

দরজা খুলে অনিমেষ প্রশ্ন করে, কি চাস?

একজন বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

কে? নাম বলেছে কিছু?

ভৃত্য বলে, হ্যাঁ, বারীনবাবু—

যা এখানে নিয়ে আয়।

কিছুক্ষণ পরেই ষণ্ডা চেহারার একজন দীর্ঘকায় স্যুট পরিহিত ব্যক্তি ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলো। অন্ধকার ঘরে পা দিয়ে মুহূর্তের জন্য

যেন থমকে দাঁড়ালো বারীন।

তারপরই মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, আমাকে ডেকেছিলেন ?

হ্যাঁ, দরজাটা বন্ধ করে দাও বারীন। তোমার সঙ্গে কিছু জরুরী কথা আছে।—অন্ধকার থেকে নির্দেশ এলো।

বারীন ফিরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

শোন বারীন, আপাতত বছর খানেকের জন্য ভেবেছি কাজ কারবার সব বন্ধ রাখবো।

হঠাৎ ?

হঠাৎ নয়। গত মাসখানেক ধরে ভেবেই এটা আমি স্থির করেছি। গত একমাসের মধ্যে আমাদের দলের তিন তিন জন লোক ধরা পড়েছে, একজন পাটনায় পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে। পুলিশ হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে আমাদের দলটাকে ধরবার জন্য।

কিন্তু স্যার, কারবার বন্ধ করলে—

বললাম তো তোমাকে আপাতত তা ছাড়া আর উপায় নেই। পেশোয়ারে আনোয়ার খান, বুন্দেলখণ্ডে মহব্বৎ খাঁকে সেই মর্মেই আমি সংবাদ পাঠিয়েছি—

এতদিনের এমন জমাট কারবারটা তুলে দেবেন স্যার তুচ্ছ ক'টা দলের লোকধরা পড়েছে বলে ? কাজ কারবার চালাতে গেলে এরকম তো হয়েই থাকে।

তা জানি।

তাছাড়া এর আগেও যে দু' একজন ধরা পড়েনি তাও তো নয় স্যার !

পরামর্শ দেবার জন্য তোমাকে আমি ডাকিনি বারীন। যা বলবার ছিল তা আমি বললাম। তুমি এবার যেতে পারো।

কিন্তু যে সব মাল এখনো আমাদের হাতে আছে ?

রমজান তার ব্যবস্থা করে ফেলেছে, সেজন্য তোমাদের ভাবতে হবে না। যাও—

বারীন ধীরে ধীরে ঘরের দরজা খুলে বের হয়ে গেল।

অনিমেষ ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। না, আর আগুন নিয়ে খেলা নয়।

কিন্তু কেন ? হঠাৎই বা অনিমেষের মনে এ বৈরাগ্য দশ বছর বাদে আজ এলো কেন ? দশবছর ধরে নির্বিঘ্নে আফিমের চোরা কারবার গড়ে তুলেছে অনিমেষ বিখ্যাত চোরা কারবারী পাঠান কালু খাঁর সাহায্যে। বলতে গেলে ভারতবর্ষের সর্বত্র ধীরে ধীরে সেই কারবার আজ যখন শাখায় প্রশাখায় জমজমাট হয়ে উঠেছে তখন হঠাৎ সে কারবার গুটিয়ে নিতেই বা কেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে অনিমেষ। দলের একজন মারা গেছে ও তিনজন একমাসের মধ্যে ধরা পড়েছে বলে পুলিশের ভয়ে ? কিন্তু ইতিপূর্বে ঐ ধরনের ঘটনা যে ঘটেনি তাতো নয়, বারীন তো একটু আগে মিথ্যা বলেনি। তবে আজই

বা অনিমেষ কারবার গুটিয়ে নেবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠলো কেন ?

আজ নয়, অনিমেষ হয়ত নিজেও বিশ্বাস করতে চাইবে না, গত এক বৎসর ধরেই অনিমেষের মনের মধ্যে সব ব্যাপারেই একটা নিস্পৃহতা জেগেছে। কিছুই তার আজকাল ভাল লাগে না, কোন কিছুতেই যেন আর উৎসাহ পায় না। আজ যেন তার মনে হচ্ছে সব, সব ফাঁকি। এই পরিশ্রম, সর্বদা এই চোরের মত সশঙ্ক আত্মগোপন, সামান্য একটা সুতোর 'পরে জীবন নিয়ে ঘোরাফেরা করা, আজ যেন সব কিছু একান্ত নিরর্থক মনে হচ্ছে অনিমেষের। অর্থ, অর্থ—সে চোরাকারবারে প্রচুর উপার্জ্জন করেছে। তবু আজ কেন মনে হচ্ছে ঠিক এই জীবন বা জীবনের এই পরিণতি সে যেন কোনদিনই চায়নি। এ একটা বিরাট আত্ম প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। নির্দিষ্ট একটি দড়িতে খুঁটোয় বাঁধা গরুর মত এই যে একই পরিধির মধ্যে কেবল কানামাছির মত ঘোরা, এর মধ্যে জীবন কোথায় ? কোথায় এ জীবনের মধ্যে স্পন্দন। লোভ শুধু পাপের অন্ধকারে টেনেই নিয়ে চলেছে তাকে দিনের পর দিন।

আজ তাই যেন মনে হচ্ছে এর চাইতে বুঝি ঢের বেশী তৃপ্তি, ঢের বেশী শান্তি ছিল নির্জন একটি গৃহকোণের মধ্যে। একখানি প্রিয় হাতের মধুর স্পর্শ, মমতা মাখানো একটুখানি সেবা, দুটো মিষ্টি কথা, তাতে যেন ঢের বেশী তৃপ্তি, ঢের বেশী আনন্দ সে পেতে পারতো।

সে তো চায়নি, কোনদিনই চায়নি সমাজকে এমনি করে অস্বীকার করতে। সমস্ত সমাজ ব্যবস্থাকে তছনছ করে অভিশাপের অন্ধকার পথ ধরে চলতে। সমাজ! সমাজই তাকে ঠেলে দিয়েছে জন্মমুহূর্তে আজকের এই আবর্জনার মধ্যে! অনাথ আশ্রমের নাম গোত্র পরিচয়হীন জীবনের আঠারোটা বছর কাটিয়ে একদিন যখন সে এই শহরে এসে দাঁড়িয়েছিল, কেউ দেখায়নি তাকে এতটুকু সহানুভূতি, এতটুকু আশা দেয়নি কেউ, দুয়ারে দুয়ারে প্রত্যাখ্যান হয়ে শেষ পর্যন্ত বিখ্যাত চোরা কোকেন ও আফিং ব্যবসায়ী পাঠান কালু খাঁর নজরে পড়ে, তারই দয়ায় ক্রমে ক্রমে সে এই চোরা অন্ধকার পথের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারপর অকস্মাৎ একদিন মাল সমেত বড়বাজারের পাট্টিতে ধরা পড়ে সম্মুখ যুদ্ধে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিল তার পিতৃতুল্য পাঠান কালু খাঁ।

কিন্তু বছর দুই ধরে কালু খাঁ সবচাইতে প্রিয় শিষ্য হিসাবে অনিমেষকে যে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিল, সেটা ব্যর্থ হয়নি। অনিমেষ ধীরে ধীরে বুদ্ধি ও চাতুর্যের দ্বারা নিজের পথ তৈরী করে নিয়েছিল। ক্রমে বিরাট দলের দলপতি হয়ে আজ সে ভারতের সর্বত্র চালাচ্ছে তার চোরা কারবার। কিন্তু কি কুক্ষণে যে দলের অন্যতম লোক রমেন্দ্রবাবুকে সে দয়া করে এই বরাহনগরের বাড়ীতে সকন্যা স্থান দিয়েছিল।

রমেন্দ্রের মেয়ে করবীর সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকেই যেন ক্রমে ক্রমে সব

কিছু তার কাছে ফাঁকা ঠেকতে শুরু করলো। করবী, করবী যেন তার অন্ধকারে ঘুমন্ত আত্মার ঘুম ভাঙ্গালো সোনার কাঠির স্পর্শে সহসা একদিন, অন্ধকারে প্রথম যেন অনিমেষ চোখ মেলে তাকালো। কুটিল জীবনের পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে সহসা যেন ভেসে এলো একটি মধুগন্ধ স্বর্ণ চাঁপা।

প্রথমটায় অনিমেষের শঙ্কা বা লজ্জার অবধি ছিল না। একে নাম গোত্র পরিচয়হীন, দেখতে ভয়াবহ কুৎসিত এবং সর্বোপরি আফিমের চোরা কারবারী হিসাবে সমাজের নিম্নতম অন্ধকার আবর্তের মধ্যে গতিবিধি, করবীর সান্নিধ্যে পর্যন্ত যেতে তার সাহসে কুলতো না। কিন্তু সে সংকোচ যেন করবীই তার মধুর ব্যবহারে একটু একটু করে ভেঙ্গে দিয়েছিল। এবং সেই সান্নিধ্য যে ক্রমশঃ তাকে এক অন্ধ দুর্বার আকর্ষণে করবীর প্রতিই টানছিল, সেই সত্যটি যেদিন প্রথম অনিমেষের কাছে সুস্পষ্ট হলো সেদিন সে যেন লজ্জায় ও ভয়ে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেল। একি দুরাশা, কোথায় করবী আর কোথায় সে এক পুলিশের ভয়ে সদা সশঙ্কিত পলাতক ছদ্মবেশী চোরা কারবারী। এবং সেই সত্যটুকুই নিজের কাছে উদ্ঘাটিত হবার পর থেকেই গত কয়েকমাস ধরে নিজের মনের সঙ্গে দিবারাত্র যুদ্ধ করে ক্লান্ত অনিমেষ স্থির করেছিল এই বাড়ী ছেড়ে দূরে অনেক দূরে পালিয়ে যাবে। বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস নেই তার নিজের মনকে! এবং এতদিনে অমিমেষ চলেও যেতো, কিন্তু নির্মল চৌধুরীর ব্যাপারটায় হাত দেওয়ায় যাওয়া হয়নি তার। করবীর জীবনের পথ নিষ্কণ্টক করে তবে সে যাবে। চিরদিনের মতই দূরে চলে যাবে।

শুধু যে চলে যাওয়ার জন্যই প্রস্তুত হয়েছিল অনিমেষ তাই নয়, যে ভালোবাসার আলো তার অন্ধকার মনের মধ্যে জ্বলে উঠেছিল, সেই আলোর স্পর্শই তার মনের মধ্যে এনেছিল এতদিনকার কারবারের প্রতি একটা তীব্র বিতৃষ্ণা। তাই আজ চিরদিনের মতই পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে যাবে।

অনিমেষ ঘরের মধ্যে পায়চারি করে চলে।

॥ ষোল ॥

পাশের ঘরে করবীও জেগে ছিল চুপটি করে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে। ইচ্ছা করেই দরজা ভিতর থেকে বন্ধ না করে মাত্র ভেজিয়ে অন্ধকারে সতৃষ্ণ নয়নে সেই দিকে তাকিয়ে ছিল। একটু শব্দ, তারপর ঈষৎ উন্মুক্ত দ্বারপথে কি আবার দেখা দেবে না সে।

কেন যেন মন বলে বারবার, আসবে, আবার সেদিনের মত আসবে নির্মল তার ঘরে। কিন্তু কেন, কেন নির্মল তাকে ভুল বুঝলো। কেন নিজের পরিচয়টা দিল না। সেই রাত্রির পর থেকে করবী নির্মলকে কত খুঁজেছে।

পথ দিয়ে চলতে চলতে আশে পাশের প্রতিটি মানুষের মুখের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। খুঁজেছে তার পরিচিত সেই প্রিয় মুখখানি, কিন্তু কোথাও পায়নি সে মুখের আদল। সে মুখ যে তার মনের পাতায় ছাপ কেটে বসে আছে।

কেন, কেন নির্মল তাকে দেখা দিচ্ছে না? পরক্ষণেই আবার মনে হয়, নির্মল তো তাকে আশ্বাস দিয়ে গিয়েছে, আবার দেখা হবে। কলঙ্কমুক্ত হয়ে আবার সে দেখা দেবে। তবে কেন করবী মনে ধৈর্য ধরতে পারছে না।

সে রাত্রে হোটেলে নিজের নির্দ্দিষ্ট ঘরটির মধ্যে একাকী বিনিদ্র শয্যার 'পরে শুয়ে শুয়ে করবীর কথাই ভাবছিল নির্মল। সে রাত্রে করবী কি তাকে চিনতে পারলো না!

কিন্তু সেই অদৃশ্য বন্ধুর কঠোর নির্দেশ আছে, আপাততঃ করবীর কথা সম্পূর্ণই তাকে ভুলে গিয়ে যে কারণে তাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে—তার ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোস খুলে দিতে হবে সর্বাগ্রে। তারপর করবী তাকে চিনতে পারুক না পারুক, সে রাত্রের সাক্ষাতের পর এটা তো সে স্পষ্টই বুঝেছে, করবী এখনো তারই আছে। করবী তাকে ভোলেনি। তবু অবুঝ মন বার বার করবীর সান্নিধ্যেই যেন ছুটে যেতে চায়।

না, না—করবীর কথা থাক। আগে তাকে এই আত্মগোপনের অপমান ও লজ্জা থেকে মুক্তি পেতে হবে।

কিন্তু সেই ষড়যন্ত্রের রহস্যভেদের কোন কিনারাই সে এখন পর্যন্ত করে উঠতে পারেনি। অদৃশ্য বন্ধু তাকে চিঠির সুপারিশে তার পুরাতন অফিসে চাকরি করে দিয়েছে যে কেন, তাকে সে কথা খোলাখুলি ভাবে না বললেও নির্মলের বুঝতে কষ্ট হয়নি। তার বিরুদ্ধে নরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পূর্বে একটা বিশ্রী ষড়যন্ত্র যে চলেছিল তার কিছুটা আভাষ ইদানিং সে পেয়েছে। কিন্তু সেই ষড়যন্ত্রের মূলে যে কারা, সেটাই এখনো বুঝে উঠতে পারেনি। শ্রীনাথ করকে যে কেন হত্যা করা হলো সেটাও এখনও পর্যন্ত বুঝতে পারছে না নির্মল।

নেহাৎ গোবেচারী ও অনেক দিনের পুরোনো লোক ছিল শ্রীনাথ কর। অফিসের ম্যানেজার হিসাবে তার সঙ্গে যেটুকু পরিচয় ছিল তাতে করে লোকটাকে কোনদিন খারাপ বলে তো মনে হয়নি নির্মলের। তার মৃত্যুর ব্যাপারটা সত্যিই আশ্চর্য্যের।

কিন্তু আজ বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে রাত্রে বিনয়েন্দ্র যে কথাগুলো তাকে বললেন, সে কথাগুলোরেই বা তাৎপর্য কি! পার্সোন্যাল একাউণ্টে গত এক বৎসর ধরে নিজের অফিস থেকে ও বর্তমানে নরেন্দ্রনাথের অফিস থেকে গত দুই মাসে যে সব টাকা তিনি ড্র করেছেন, সে সব টাকা অফিসের মিসলেনিয়াস

খরচের খাতে দেখিয়ে দিতে বললেন।

এক আধটা টাকা নয় প্রায় হাজার কুড়িক টাকা। এতগুলো টাকা মিস্‌লেনিয়াস খাতে দেখানোও মুস্কিল।

আর তার প্রয়োজনই বা কি। অফিসের অন্যতম প্রোপ্রাইটার হিসাবে তো অনায়াসেই ও টাকা তিনি নিজের ইচ্ছামত খরচ বাবদ দেখাতে পারেন। মিস্‌লেনিয়াস খাতে সে টাকা দেখানো মানে সহজভাবে যা বোঝা যাচ্ছে তা হচ্ছে সকলের ঘাড়েই সে খরচটা যাবে। কিন্তু নিজে যে টাকাটা খরচ করবেন ব্যক্তিগতভাবে সে টাকাটা ঐভাবে খরচ দেখানোর মানেটা তো খুব ভাল লাগছে না নির্মলের। তাছাড়া আরো একটা কথা ; আজ রাত্রে বিনয়েন্দ্র তাকে যা বলেছেন অফিসের মনোহরবাবু সম্পর্কে সেটাও নির্মলের মনঃপুত হয়নি।

মনোহর শিকদার লোকটার চেহারা যেমন তেমনি যেন চরিত্র। কালো মোটা, থলথলে চর্বিবহুল, ছোট ছোট চোখ, পুরু ওষ্ঠ ছড়ানো নাক ও চৌকো চোয়াল। দেখলেই কেমন যেন বিতৃষ্ণা জাগে। বিনয়েন্দ্রের নিজস্ব অফিসে পূর্বে ম্যানেজার ছিল, এখন দুই অফিসেরই কাজকর্ম দেখছে সুপারভাইজার হিসাবে। যেমন রুক্ষ কথাবার্তা তেমনি সন্দিগ্ধ মন।

প্রথম দিন থেকেই মনোহর শিকদারকে নির্মলের ভাল লাগেনি। কিন্তু নির্মল কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিল মনোহর শিকদার বিনয়েন্দ্রের নিজস্ব তাঁবের লোক। এবং সে হিসাবে অফিস সংক্রান্ত ব্যাপারে তার ক্ষমতাও অসীম।

অফিস সুপারভাইজার বটে মনোহর কিন্তু আসলে যে কি সুপারভাইজ করে তা নির্মল জানেনা বা এখনো সম্যক বুঝে উঠতে পারেনি। সর্বক্ষণ অফিসে থাকেও না। হুট করে আসে আবার হুট করে চলে যায়। বিনয়েন্দ্রের অফিসের পাশেই একটা ছোট কামরায় মনোহরের অফিস। বিনয়েন্দ্র অফিসে এলেই মনোহর তার অফিস কামরায় গিয়ে ঢোকে এবং বিনয়েন্দ্র অফিস থেকে বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে-ঘর থেকে বের হয় না। নির্মলের সঙ্গে মনোহর যদিও আজ পর্যন্ত এই এক মাসে কোনরূপ দুর্ব্যবহার করেনি, তথাপি মনোহরকে নির্মলের এতটুকু ভাল লাগেনা। শুধু নির্মলই নয়, মনোহরকে অফিসের কোন কর্মচারীই যেন পছন্দ করেনা এ খবরটাও নির্মল সংগ্রহ করেছে ইতিমধ্যেই।

মনোহর সম্পর্কে বিনয়েন্দ্র আজ বলেছেন, তার সঙ্গে পরামর্শ না করে যেন অফিসের কোন কাজ না করা হয়।

॥ সতের ॥

টুক্ টুক্ টুক্ : বন্ধ দরজার গায়ে মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

কে! শোনবার ভুল নয়তো নির্মলের। এত রাত্রে হোটেলে তার ঘরের দরজায় কে নক্ করবে।

কিন্তু না, শোনবার ভুল নয়। টুক্ টুক্ টুক্। আবার পূর্ববৎ তিনটি টোকা পড়লো, এবারে আরো একটু স্পষ্ট তারই ঘরের দরজায় কৌতূহলী নির্মল এগিয়ে গিয়ে আলো জেবলে দরজার সামনে দাঁড়াল। এত রাত্রে কে কে দরজায় নক্ করছে। খুলবে কি খুলবে না।

কে ?

দরজাটা খুলুন নির্মলবাবু—চাপা সতর্ক কণ্ঠে দরজার ওপাশ থেকে কথাগুলো শোনা গেল।

নির্মল! তার নির্মল নামটা তো এখানে কেউ জানেনা। শুধু তাই নয় নির্মল নামটা গত দুমাসে সে নিজেও কি প্রায় ভুলতে বসেনি। সে তো এখন বিকাশ নামেই পরিচিত। তবে কে কে তাকে তার পূর্ব নাম ধরে ডাকছে এত রাত্রে দরজা খুলে দেবার জন্যে।

নির্মলবাবু!—আবার পূর্ববৎ চাপা কণ্ঠে ডাক এলো।

নিশ্চয়ই তার কোন পূর্ব পরিচিত জন—যে জানে নির্মল আজো বেঁচে আছে। বিকাশ তার ছদ্মবেশ মাত্র। কিন্তু কে, কে জানে তার সত্য পরিচয়টা বর্তমান ছদ্মবেশের অন্তরালে। একমাত্র জানে বন্ধু ডাঃ জহর সেন আর—আর তো কেউ জানে না। জহর অবশ্য জানে তার এখানে অবস্থিতির কথাটাও। তবে কি জহরই।

নির্মল দরজাটা খুলে দিল। কিন্তু দরজার কপাট দুটো টেনে খুলতে গিয়ে পারল না। সামান্য একটু মেলেই যেন দরজার কপাট দুটো চকিতে বন্ধ হয়ে গেল ওপাশ থেকে কে টেনে ধরায়। এবং পরক্ষণেই পূর্ব কণ্ঠস্বর আবার ভেসে এলো, আলোটা নিভিয়ে দিন দয়া করে।

এ কি! চমকে ওঠে নির্মল, এ যে তার পরিচিত কণ্ঠস্বর। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এই কণ্ঠস্বরই না সে শুনেছিল জহরের বাড়ীতে অন্ধকার ঘরের মধ্যে একদিন রাত্রে। আর দ্বিধা করে না নির্মল। হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিল। ঘর অন্ধকার হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল আর নিঃশব্দে এক ছায়া মূর্তি এসে ঘরের মধ্যে পা দিল।

ভয় পাবেন না নির্মলবাবু। কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথা বলবার জন্য এসেছি। আশা করি আমাকে চিনতে পেরেছেন ?

হ্যাঁ।—অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় নির্মল।

আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীকে বোধ হয় এখনও আপনি চিনতে পারেননি?

না। কিন্তু আপনি যদি জানেন—

আমিও সঠিক জানিনা। শুধু অনুমান মাত্র।—যাক যা বলতে এসেছিলাম। মনোহর শিকদারের উপরে একটু নজর রাখবেন।

মনোহর শিকদার!

হ্যাঁ, আপনাদের অফিসের মনোহর শিকদার। একটা কথা মনে রাখবেন, অফিসে আর কেউ আপনাকে আপাতত সন্দেহ না করলেও মনোহর কিন্তু আপনার সম্পর্কে একটু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে।

কি করে জানলেন?

প্রত্যুত্তরে মৃদু একটা হাসির শব্দ অন্ধকারের মধ্যে শোনা গেল। তারপর আবার জবাব এলো, অফিসে আমার লোক আছে।

সে কি!

হ্যাঁ, সে অবিশ্যি আপনার সাহায্যেই আসবে। তার দিক থেকে ভয় নেই, তার দ্বারা আপনার ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যা বলছিলাম। মনোহরের বাসা বাদুড়বাগানে। অফিস থেকে বাসায় গিয়ে ফের সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা নাগাদ বাসা থেকে বের হয়ে প্রত্যহই প্রায় বি, টি, রোডের ওপরে 'মতিঝিল' নামে একটা বাগান বাড়ীতে যায় সে।

মতিঝিল!

হ্যাঁ, তাকে কিছুদিন সতর্কতার সঙ্গে ফলো করতে পারলে হয়ত আপনি কিছু জানতে পারবেন।

বেশ তাই হবে।

কাজটা অবিশ্যি আমিও করতে পারতাম, কিন্তু আমার সেখানে যাবার উপায় নেই।

কিন্তু আমিই বা যাবো কি করে?

মধ্যে মধ্যে ঐ মতিঝিলে কলেজের তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মেলন হয়। সামনের রবিবার একটা ঐ ধরনের সম্মেলন আছে। ঐ ধরনের সম্মেলনের সময় সেখানকার মানে ঐ মতিঝিলের মালিক ওখানে সাধারণতঃ অনুপস্থিত থাকেন। সেদিন যাতে আপনি সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেন গোপনে চেষ্টা করবেন।

কিন্তু—

বললাম তো। মতিঝিলের মালিক অনুপস্থিত থাকবেন সেদিন। একমাত্র তিনি ছাড়া আপনাকে আর কারোরই চিনবার সম্ভাবনা নেই।

তিনি! মতিঝিলের মালিক আমাকে চেনেন?

হ্যাঁ।

কি নাম তাঁর ?

সন্তোষ মিত্র।

কিন্তু কই তাঁকে চিনি বলে তো আমার মনে পড়ছে না।

আপনিও তাঁকে চেনেন।

আমি তাঁকে চিনি ?

হ্যাঁ। তবে সন্তোষ মিত্রকে দেখলে আপনি তাঁকে চিনতে পারবেন কিনা জানি না।

কি বলছেন আপনি! আপনার কথা তো ঠিক আমি—

একদিন সবই বুঝতে পারবেন। আর একটা কথা—

বলুন।

করবীদেবীর সঙ্গে ইতিমধ্যে একদিন রাত্রে আপনি দেখা করতে গিয়েছিলেন ?

আপনি! আপনি সে কথা জানলেন কি করে ?

জানি। কারণ আমার লোকেরা সর্বদাই আপনাকে পাহারা দিচ্ছে।

ও।

কিন্তু আর যাবেন না। ভুলে যাবেন না আপনি ছদ্মবেশে আছেন। তাছাড়া নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার করবী চিরদিন আপনারই থাকবে। কেউ তাকে আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। সে আপনারই—শেষের দিকে নির্মলের যেন মনে হলো বক্তার কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন রুদ্ধ হয়ে জড়িয়ে যায়।

চমকে অন্ধকারে ছায়ামূর্তির দিকে তাকালো নির্মল।

কিন্তু রুবি—করবীর মনের কথা আপনি জানলেন কি করে ?

আমি জানলাম কি করে ?

হ্যাঁ।

প্রত্যুত্তরে আর কোন জবাব এলো না। শুধু নির্মলের মনে হলো যেন অন্ধকারে একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল।

মুহূর্তের জন্য নির্মল বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই যখন সম্বিত ফিরে আসে দেখে ঘর শূন্য। ঘরে কেউ নেই। রহস্যময় সেই আগন্তুক ঘর থেকে ইতিমধ্যে অন্তর্হিত হয়েছে নিঃশব্দেই।

॥ আঠারো ॥

কিরীটির দোতলার বসবার ঘরে দুটো সোফায় মুখোমুখি বসে কথা বলছিল কিরীটি আর সুব্রত। কিরীটি তার স্বভাবসিদ্ধ এলানো ভঙ্গীতে সোফার ব্যাকে হেলান দিয়ে পাইপ টানতে টানতে কথা বলছিল।

গত বৎসর খানেকের মধ্যে যে তিনটি সুন্দরী কলেজ তরুণী অত্যাশ্চর্যভাবে কলেজ গেটের সামনে থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে, তাদের মধ্যে অবিশ্যি আজ পর্যন্ত একটিরও পাত্তা পাওয়া যায়নি, কিন্তু বাকী দুজনার মৃতদেহ দক্ষিণেশ্বরের কাছাকাছি গঙ্গার ধারে পাওয়া গিয়েছিল।

হ্যাঁ, সে সংবাদ তো খবরের কাগজেই বের হয়েছিল।

পরশুদিন গ্রাণ্ডে একটা পার্টিতে ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টার পূর্ণ লাহিড়ীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কথায় কথায় তার মুখ থেকে আরো একটা সংবাদ পেয়েছি।

কি?

ময়না তদন্তে বলছে যে, ঐ দুটি তরুণীরই মৃত্যু হয়েছে নাকি জলে ডুবে। কজ্ অফ ডেথ্ ড্রাউনিং।

তাহলে আত্মহত্যা।

হতে যে পারেনা তা নয়। তবে আত্মহত্যার কোন কারণই নাকি খুঁজে পাওয়া যায়নি তাদের। এবং খোঁজ করে জানা গেছে দুজনই তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী ছিল এবং দুজনাই গরীব ঘরের মেয়ে ছিল?

কি বলতে চাস তুই কিরীটি।

বিশেষ কিছুই না। মেয়ে তিনটিই অর্থাৎ যে দুটিকে মৃতাবস্থায় পাওয়া গিয়েছে ও যেটি এখনো নিখোঁজ তিনজনই মতিঝিলে তরুণ-তরুণীর হৈ-হল্লায় দু' একবার যোগ দিয়েছে এ সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। তাই মনে হচ্ছিল—

কি?

মতিঝিলে মধ্যে মধ্যে যে তরুণ-তরুণী সম্মেলন হয় সেটা হয়ত একেবারে নির্দোষ একটা হৈ-হল্লাই নয়।

কিন্তু সন্তোষ মিত্র সম্পর্কে আমি খুব ভাল করেই খোঁজ নিয়েছিলাম। লোকটা যেমন কাইণ্ড হার্টেড্ তেমনি শুনেছি গরীব দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি সিম্প্যাথেটিক।

তাতো বটেই! কাইণ্ডনেস্ ও সিম্প্যাথি মানব চরিত্রের অতীব দুর্লভ দুটি সদ্গুণ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কাইণ্ডনেস্ ও সিম্প্যাথি প্রদর্শনের পাত্র পাত্রীরা আবার বিশেষ বয়েসের কিনা, তাই বলছিলাম—

তুই অত্যন্ত নোংরা হয়ে যাচ্ছিস কিরীটি আজকাল—

পৃথিবীটাই যে ক্রমশঃ নোংরা হয়ে উঠছে সুব্রত! যেমন দেখি তেমনি তো শিক্ষা হবে। সে যাক্—অপূর্ববাবুর সন্ধান পেলি?

না। আজই তো শনিবার। চায়না হোটেলে একবার ঘুরে তো আসি।

কিন্তু চায়না হোটেলের অভিসারের চাইতেও বেশী উপকৃত হবি তুই যদি সামনের রবিবার মতিঝিলে একবার হানা দিতে পারিস।

কেন, রবিবারে সেখানে বুঝি আবার সম্মেলন।

হ্যাঁ। এবম্বিধ সংবাদই প্রাপ্ত হয়েছে।

তবে নিশ্চয়ই যাবো।

নিজে না গিয়ে কোন কলেজের ছাত্র বন্ধু একজন জোগাড় করতে পারিস তো তাই দেখ।

যুক্তি ভাল দিয়েছিস। দেখি—

টেরিটি বাজারের পিছন দিয়ে যে নয়া রাস্তাটা এসে ট্রাম রাস্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঠিক সেইখানেই চায়না হোটেল। হোটেলটি সম্পর্কে অনেকদিন থেকেই একটা দুর্ণাম আছে বটে চোরাই মাদক দ্রব্যের ব্যাপারে, কিন্তু আজ পর্যন্ত পুলিশের সতর্ক গতিবিধি নিশ্চিত কোন প্রমাণই পায়নি। তবে সন্দেহের তালিকাভুক্ত আছে বলেই পুলিশ এখনো হোটেল থেকে তার দৃষ্টি তুলে নেয়নি।

চায়না হোটেলের বিশেষত্ব চাইনীজ ডিসের জন্য যেমন সেখানে অনেক ভোজন বিলাসীর গতায়াত হামেশাই, তেমনি সঙ্গে 'বার্' থাকার দরুণ মদ্যপায়ী অন্য এক শ্রেণীর নেশাখোরের ভিড়ও সেখানে হয়। এবং উপরিউক্ত দুই শ্রেণীর নানা ভাষাভাষী খদ্দেরের জন্য হোটেলটায় রাত আটটা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত প্রতি রাত্রে একটা কস্‌মোপলিটন ভিড় হয়। বিশেষ করে প্রতি শনিবার ভিড়টা যেন একটু বেশীই হয়।

পরিধানে পায়জামা, শেরওয়ানী ও লালচে আভাযুক্ত নূর দাড়িতে সুব্রতকে চিনবারও উপায় ছিল না। বিরাট হলঘরের এক পাশে একটা ছোট টেবিলে এক গ্লাস বীয়ার ও কিছু কাজু বাদাম প্লেটে নিয়ে সুব্রত বসে ছিল। এবং মধ্যে মধ্যে বীয়ারের গ্লাসটা ঠোঁটের গোড়ায় ধরে ছোট্ট একটা সিপ্ দিচ্ছিল।

বিশ্রী তেতো। মুখের বিস্বাদকে নষ্ট করবার জন্য একটা বাদাম মুখে দিয়ে চিবোচ্ছিল।

রাত ন'টার পর থেকে সুব্রত লক্ষ্য করে ভিড়টা ক্রমশঃ যেন জমে উঠছে বোতলসেবীদের নিয়েই। নানা বয়েসের পুরুষ, নারী, বিচিত্র সব পোষাক। বাঙ্গালী থেকে শুরু করে ইওরোপিয়ান, চাইনিজ, জাপানীজ, মদ্রদেশীয়, পাঞ্জাবী, গুজরাটি ও মাড়োয়ারী সর্বদেশীয় লোকই আছে।

এককোণে ডায়াসে একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে রুজ, লিপষ্টিক মাখা অর্ধ উলঙ্গ প্রায় বেশে কুৎসিত যৌন অঙ্গভঙ্গি করে নাচছে আর নাকী সুরে গান গাইছে। সঙ্গে চলেছে অর্কেণ্ট্রা।

আই লাভ ইউ মাই হনি চাইল্ড
আই লাভ ইউ আই ডু।

আই কিস্ ইউ মাই হনি চাইল্ড
আই কিস্ ইউ আই ডু।

ফিটফাট উর্দি পরিহিত একটি ওয়েটার জার্মান সিলভারের একটা চক্‌চকে প্লেট হাতে সামনে এসে দাঁড়ালো সুব্রতর। সুব্রত ইতিমধ্যে একসময় সবার অলক্ষ্যে পাত্রটি সামনের টেবিলের 'পরে রক্ষিত কাচের ফ্লাওয়ার ভাসের মধ্যে ঢেলে দিয়ে খালি করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিল।

এনি মোর ড্রিঙ্ক স্যার?

ছোটা জিন্ এণ্ড লাইম।—মৃদু কণ্ঠে সুব্রত বলে।

ওয়েটার চলে গেল।

হঠাৎ সুব্রতর নজরে পড়লো হলঘরের বিরাট কাচের পাল্লা নিঃশব্দে হিঞ্জের উপরে ঘুরে গিয়ে দ্বার উন্মুক্ত হলো এবং সেই উন্মুক্ত দ্বারপথে মনোহর শিকদার ও একটি বাইশ তেইশ বৎসরের তরুণী হোটেলের মধ্যে এসে প্রবেশ করলো। তাদের পশ্চাতে দরজাটি আবার বন্ধ হয়ে গেল।

মনোহর শিকদার! ও এখানে কেন? আর ঐ মেয়েটিই বা কে?

দামী শাড়ী পরিহিত এবং মুখের 'পরে একটা দামী স্কাই ব্লু রংয়ের সিল্কের ভেইল টানা। মুখটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছেনা, কেবল সুশ্রী একখানি মুখের একটা আবছায়া ইঙ্গিত মাত্র যেন ভেইল ভেদ করে উঁকি দিচ্ছে।

সমস্ত হোটেলে তখন একমাত্র সুব্রতর পাশের ছোট একটি টেবিলের পাশে তিনটি চেয়ার ছাড়া সব ভর্তি। মনোহর ও তার সঙ্গিনী তরুণী এসে সেই টেবিলেই বসলো।

জায়গাটা একেবারে এক কোণে হওয়ায় ও একটা থামের আড়ালে পড়ায় যেন একটু নির্জনই বলতে হবে। হঠাৎ মৃদু নারী কণ্ঠের একটা কথা সুব্রতর কানে এলো: এ কোথায় নিয়ে এলে বল তো?

কি করি। ইচ্ছাটা তো আর আমার নয়। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

কিন্তু এখানে আনবারই বা প্রয়োজন ছিল কি? ইচ্ছা করলেই তো সে আমার ওখানে যেতে পারতো।

দেখো, এসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করে কোন লাভ আছে?

কিন্তু সত্যি বলতো ব্যাপারটা কি? তুমি একেবারে কিছুই জানোনা, আমি বিশ্বাস করিনা।

জানিনা।

জানো নিশ্চয়ই।

সবটা জানিনা, তবে কিছু কিছু কানে এসেছে।

তবে সেই কিছুটাই নাহয় শুনি।

কালকের মতিঝিলে যে সম্মেলনটা আছে—

সুব্রত চমকে ওঠে 'মতিঝিল' নামটা শুনে। সমস্ত শ্রবণেন্দ্রিয় কেন্দ্রীভূত করে ও যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকে।

নারীকণ্ঠে আবার প্রশ্নোচ্চারিত হয়, তাই কি ?

সামনের মাসের পনেরই যে কর্তার দক্ষিণেশ্বরের বাগান বাড়ীতে পার্টি আছে—

দক্ষিণেশ্বরের বাগান বাড়ীর পার্টি !—কথাটা উচ্চারণের মধ্যে যেন একটা ব্যগ্র উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ে সেই নারীকণ্ঠ থেকে।

ব্যাপার কি ! চমকে উঠলে যেন ?

না····

বাকী কথাটা শোনা গেলনা। প্রচণ্ড একটা করতালির শব্দে সমস্ত হলঘরটা যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে গুঁড়িয়ে গেল।

কয়েকটা মুহূর্তের জন্য সুব্রত একটু বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সুব্রতর যখন খেয়াল হলো তখন আবার সেই ফিরিঙ্গি মেয়েটি কুৎসিৎ নৃত্যের সঙ্গে গান শুরু করেছে। পাশ ফিরে তাকিয়ে সুব্রত মনোহর ও তার সঙ্গিনীকে আর দেখতে পেলনা।

ইতিমধ্যে কখন তারা যেন চেয়ার শূন্য করে উঠে গিয়েছে।

সামান্য একটু অন্যমনস্কতার গাফিলতিতে সুব্রত বুঝতে পারে মনোহর শিকদার সঙ্গিনীসহ তার প্রখর দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়েছে। তবু চারিদিকে প্রখর দৃষ্টিতে একবার তাকাল, কিন্তু হলের মধ্যে কোথাও তাদের দেখতে পেল না। হাত ঘড়ির দিকে তাকালো একবার সুব্রত, রাত সাড়ে দশটা প্রায়। তবু অপেক্ষা করে সুব্রত, যদি আবার মনোহর ও তার সঙ্গিনীর আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু বৃথাই। আর সে যুগল মূর্তিকে হলের মধ্যে দেখতে পাওয়া গেল না।

॥ উনিশ ॥

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙ্গালো সুব্রতর একটানা টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দে।

চোখের ঘুম তখনো যেন চোখের পাতা ভারী করে আছে। কোন মতে এসে রিসিভারটা তুলে নিল সুব্রত, হ্যালো—

সুব্রতবাবু ?—নারী কণ্ঠে প্রশ্ন ভেসে এলো।

কথা বলছি। কে ?

আমি বেবী।

মুহূর্তে যেন সুব্রতর চোখের পাতা থেকে ঘুম চলে যায়। উদ্‌গ্রীব হয়ে

ওঠে সুব্রত, সুপ্রভাত।
চিনতে পারছেন তো ?
মৃদু হেসে সুব্রত বলে, না।
পারলেন না চিনতে !
পূর্ববৎ মৃদু হেসে কৌতুকভরা কণ্ঠে সুব্রত জবাব দেয়, নাইবা চিনলাম, বলুন না কি কথা আছে।
আমি বেবী মানে নমিতা ঘোষ। বিনয়েন্দ্রনাথ ঘোষের—
চিনেছি চিনেছি—অত পরিচয় আর দিতে হবে না।
চিনেছেন ?
হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলুন না।
আপনার কথাই বোধহয় ঠিক।
কি ব্যাপার ?
কাল রাত্রে আমার লাইফের 'পরে—
কি ! কি বললেন ?
হ্যাঁ, দেয়ার ওয়াজ এ্যানাদার এ্যাটেম্পট।
এ্যানাদার এ্যাটেম্পট ! খুলে বলুন।
ফোনে বলা সম্ভব নয়। যদি একবার আসেন।
নিশ্চয়ই। আধঘণ্টার মধ্যেই আসছি।

সুব্রত আধঘণ্টার মধ্যেই বিনয়েন্দ্রর গৃহে পৌঁছে যায়।
করিডোরে একজন ভৃত্য দাঁড়িয়েছিল, সেই প্রশ্ন করে আপনি সুব্রতবাবু ?
হ্যাঁ—
চলুন, দিদিমণি উপরে আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।
উপরে ?
হ্যাঁ।
চল।
ভৃত্য দোতালায় একটা ঘরের পর্দা ঝোলানো দরজার সামনে এসে বললে, ভিতরে যান। দিদিমণি ঘরে আছেন।
তবু সুব্রত মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, ভিতরে আসতে পারি ?
আসুন। আসুন—সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর থেকে পরিচিত নারী কণ্ঠের আহ্বান এলো।
দামী পর্দাটা তুলে সুব্রত ঘরের ভিতরে পা দিল। বাহিরে ঝকঝকে সূর্যের আলো থাকলেও ঘরের মধ্যে যেন তার নিরংকুশ প্রবেশাধিকার পায়নি। সব ক'টি জানালাতেই ভারী সবুজ রঙের পর্দাটানা।
আসুন সুব্রতবাবু।

সুব্রত মুখ তুলে তাকালো। একটা হেলান দেওয়া গদী আঁটা চেয়ারে বসে ছিল বেবী। মাথার চুল বিস্রস্ত। চোখে মুখে একটা সুস্পষ্ট উৎকণ্ঠা ও রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি। পরিধানে সাধারণ একটি মিলের শাড়ি।

বসুন।

সুব্রত সামনে শূন্য চেয়ারটিতে বসলো।

বাইরে আবার ভৃত্যের গলা শোনা গেল, দিদিমণি চা দেবো।

হ্যাঁ, নিয়ে আয়।

কি ব্যাপার মিস্ ঘোষ।

আপনার কথাই বোধহয় ঠিক।

সুব্রত বেবীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সেদিন যখন আপনি আমাকে সাবধান করেছিলেন সুব্রতবাবু, কথাটা তো বিশ্বাস করিইনি, উপরন্তু মনে মনে হেসেছিলামও। আমার প্রাণ কেউ নিতে যাবে কেন? আমার সঙ্গে তো কারো কোন শত্রুতা নেই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে প্রব্যাবুলি ইউ ওয়্যার রাইট্ মিঃ রায়—বলতে বলতে এবারে বেবী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

সুব্রত তখনও চেয়ে আছে বেবীর মুখের দিকে।

আসুন—

কৌতূহলী সুব্রত এবারে উঠে দাঁড়ালো। বেবী অতঃপর সুব্রতকে অনুসরণ করতে বলে সোজা গিয়ে তার ঐ কক্ষেরই সংলগ্ন বাথরুমের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো।

বললে, ঐ দেখুন।

সুব্রত সামনের দিকে চেয়ে দেখে বাথরুমের বাথ্‌টবটার এক পাশে একটা রোমশ ককার স্প্যানিয়াল কুকুর পড়ে আছে।

বেবী বলে, মাই পুওর কিটি—সি ইজ্ ডেড সুব্রতবাবু!—বেদনায় বেবীর কণ্ঠস্বরটা যেন বুজে আসতে চায়।

সুব্রত বেবীর মুখের দিকে তাকালো।

বেবীর দু'চোখের কোলে স্পষ্ট অশ্রুচিহ্ন চিক্ চিক্ করছে।

হাউ ইট্ হ্যাপেন্ড। সুব্রত এবারে প্রশ্ন করে।

বেবী তখন সুব্রতর প্রশ্নোত্তরে সংক্ষেপে যা বললে তার মর্মার্থ হচ্ছে: বেবীর চিরদিনই টফির প্রতি অত্যন্ত একটা লোভ থাকায় সর্বদাই সে ঘরে ড্রেসিং টেবিলটার উপরেই একটা সুদৃশ্য কাচের কৌটোয় টফি কিনে রেখে দিত। দিনে ও রাত্রে যখন সে পড়াশুনা করতো, মধ্যে মধ্যে ঐ টফির কৌটো থেকে টফি তুলে নিয়ে খাওয়া তার যেন একটা রীতিমত অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আর ককার স্প্যানিয়াল কুকুরটি—কিটি ছিল ওর অত্যন্ত আদরের ও প্রিয়। বাড়ীতে যতক্ষণ থাকতো বেবী ঐ কুকুরটি সর্বদা যেন ছায়ার মতই

ওর সঙ্গে সঙ্গে ফিরত। মধ্যে মধ্যে বেবী কুকুরটিকে একটা দুটো মিল্ক টফি দিত। কিটিও সানন্দে তার সদ্ব্যবহার করতে কোনরূপ দ্বিধা বা অনিচ্ছা ছিল না। গতকাল রাত্রি প্রায় দশটার পর এক বন্ধুর বাড়ী থেকে নিমন্ত্রণ সেরে ফিরে বেবী ঘরে ঢুকে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চুল আঁচড়াতে যখন ব্যস্ত সেই সময় কিটি এসে ওর চারপাশে আনন্দে ঘোরাফেরা করতে থাকে। সেই সময় বেবী কৌটো থেকে দুটো টফি তুলে নিজের জন্য পাশে একটা রেখে অন্যটা ছুঁড়ে দেয় কিটিকে। তারই কয়েক সেকেণ্ড পরেই একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ ও ছটফটানীর সাড়া পেয়ে চকিতে বেবী তাকিয়ে দেখে কিটি তার পায়ের সামনে মাটিতে পড়ে যন্ত্রণাকাতর শব্দ করছে আর তার দেহটা যেন নিদারুণ এক আক্ষেপে ভেঙে দুমড়ে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। এবং ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে উঠবার আগেই কিটির দেহটা স্থির হয়ে গেল। হতভম্ব বেবী কিটির দেহটা নাড়াচাড়া করতে গিয়েই বুঝতে পারে কিটির দেহে আর প্রাণ নেই এবং তার মুখের পাশ দিয়ে নেমে এসেছে একটা রক্তের ক্ষীণ ধারা।

বেবী বলতে থাকে, ইট ওয়াজ সো সাডেন্ এণ্ড সো কুইক্ সুব্রতবাবু যে ব্যাপারটা যেন আমাকে একেবারে তখন ষ্টাণ্ট করে দিয়েছে। কি করবো, কি না করবো বুঝবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত যেন তখন আমার লোপ পেয়েছে।

॥ কুড়ি ॥

বেবী বলে চলে, তারপর যতই ব্যাপারটা ভাববার চেষ্টা করতে লাগলাম ততই যেন সব কেমন গোলমাল হয়ে যেতে লাগলো। সারাটা রাত ধরে কেবল ভেবেছি। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল আপনার সেদিনকার কথাগুলো। তবে কি আমাকেই হত্যা করবার জন্য বিষাক্ত টফি আমার টফির মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে গিয়েছিল কেউ।

সুব্রত বলে, সে বিষয়ে তো কোন ভুলই নেই।

এখন অবিশ্যি সেটা যে বুঝতে পারছি না তা নয়। কিন্তু এ যে এখনো আমি ভাবতে পারছি না সুব্রতবাবু। এ সংসারে এমন কে আমার শত্রু থাকতে পারে যে আমাকে সরাবার জন্য এভাবে দু দুবার চেষ্টা করলো।

একটা মস্ত বড় কথাই যে ভুলে যাচ্ছেন মিস্ ঘোষ। এ-সংসারে অর্থের মত অনর্থ ঘটাতে বোধহয় কিছুই পারেনা। আর সেই অর্থ আপনার প্রয়োজনের চাইতেও অনেক অনেক বেশী আছে।

অর্থ। কিন্তু জানিনা বিশ্বাস করবেন কিনা সুব্রতবাবু, অর্থ—যা আপনি বললেন আমার অনেক আছে বটে কিন্তু সত্যি বলছি সে অর্থের 'পরে এতটুকু লোভ বা আসক্তি কোন দিনই আমার নেই। আর সত্যি যদি কেউ আমার

সেই অর্থের লোভেই এ কাজ করে থাকে তো লেট্ হিম্ কাম ফরওআর্ড অত্যন্ত খুশি মনে আমার সর্বকিছু তার হাতে আমি তুলে দিতে রাজী আছি।

সুব্রত মৃদু হেসে ফেলে।

হাসছেন যে ?

আপনি এখনো দেখছি একেবারে ছেলেমানুষই আছেন। দুনিয়ার মানুষগুলো যে কি বিচিত্র যদি জানতেন। আর ঐ লোভ ব্যাপারটি মানুষের মনের মধ্যে যখন বাঘের মত থাবা গেড়ে এসে বসে তখন সময় বিশেষে যে কত বড় বিস্ময়ও ঘটতে পারে, অনেক সময় আমাদের সেটা স্বপ্নেরও অগোচর থাকে মিস্ ঘোষ।

ভৃত্য ঐসময় ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

চা পান করতে করতে তাকাচ্ছিল সুব্রত বেবীর মুখের দিকে। সদানন্দময় মুখখানির উপরে যেন একটা ক্লান্ত বিষন্ন ছায়া নেমেছে বেবীর।

ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত আপনার কথাই মনে পড়লো, আপনাকে আসবার জন্য টেলিফোন করলাম। বেবী আবার বলে।

এত ঘাবড়েই বা যাচ্ছেন কেন ?

না মিঃ রায়, ঘাবড়াইনি আমি। কিন্তু একি অশান্তি বলুন তো। আমার জীবন নিয়ে যদি কেউ খুশি হয় তো হোক, কিন্তু—

খুশি হবে মানে, তোমার প্রাণটা কি এত তুচ্ছ যে একজনের খুশির জন্য সেটা অনায়াসেই তার হাতে তুলে দেবে বেবী !

নিছক অন্তরের তাগিদেই উত্তেজনার মাথায় কথার মধ্যে নাম ধরে ডাকা ও তুমি সম্বোধনটা যে বের হয়ে এসেছে সুব্রতর সেটা খেয়াল না থাকলেও বেবীর কানে বেজেছিল। সুব্রতর শূন্য কাপটায় বেবী লিকার ঢালছিল, হঠাৎ খানিকটা লিকার ছলকে ডিসে ও টেবিলক্লথে পড়তেই সুব্রতর খেয়াল ফিরে আসে।

বেবী তখনো সুব্রতর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

কি হলো ?

য়্যাঁ।—বেবী যেন ঈষৎ চম্‌কে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই বলে, কই না, কিছু না তো। বলছিলাম পেস্ট্রীগুলো একটাও তো আপনি ছুঁলেন না।

সুব্রত সে কথার কোন জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলো, মিস্ ঘোষ, আপনার কাকাবাবুকে ব্যাপারটা জানিয়েছেন ?

না, তাছাড়া গত পরশু সকাল থেকে তিনি বাড়ীতেও নেই।

বাড়ীতে নেই ?

না। ধানবাদের কলিয়ারীতে অফিস ইন্‌সপেক্‌শনে গিয়েছেন।

মধ্যে মধ্যে যেতে হয়, না ?

হ্যাঁ, প্রায়ই যান। কিন্তু বেশ তো তুমি বলে কথা বলছিলেন, হঠাৎ আবার আপনি শুরু করলেন কেন? আপনি আমাকে 'তুমি' বলে কথা বললেই বেশী সন্তুষ্ট হবো মিঃ রায়।

সুব্রত বেবীর মুখের দিকে তাকালো। কিন্তু বেবী অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল বলে চোখাচোখি হলো না। কত সময় তুচ্ছ একটা প্রশ্ন বা ততোধিক তুচ্ছ কোন অনুরোধ মানুষকে যে কি ভাবে বিব্রত করে তুলতে পারে ভাবতেও বুঝি বিস্ময়ের অবধি থাকে না। তাই সুব্রত যখন আবার একটা নতুন প্রশ্ন তুলবার মুখে 'তুমি' ও 'আপনি' কি দিয়ে শুরু করবে ইতস্ততঃ করছে, এবং বলে, মানে তু—

বেবী মৃদু হেসে ওর মুখের দিকে তাকালো। বললে, বলুন না কি বলছেন।

হ্যাঁ, বলছিলাম ঐ কিটির মৃত্যুর ব্যাপারটা বাড়ীতে আর কেউ জেনেছে?

না, এখনো কাউকে জানাইনি, কিন্তু আর কিছুক্ষণ বাদে একসময় তো সকলেই জানবে।

সুব্রত বুঝতে পারে অত্যন্ত তীক্ষ্ম বুদ্ধি বেবীর। এখনো সে তারই অপেক্ষায় বোধহয় ব্যাপারটা জানতে দেয়নি বাড়ীর কাউকে।

হ্যাঁ, জানবে তো নিশ্চয়ই। তবে টফির ব্যাপারটা আপাততঃ চেপে যাওয়াই ভাল। সুব্রত বললে।

না, বলবো না!—বলে একটু থেমে বেবী আবার বলে, কিন্তু একটা কথা ভাবছিলাম।

কি?

এলাহাবাদে আমার এক মাসী আছেন, তার ওখানে গিয়ে মাসখানেক থেকে—

না। তাপাততঃ তুমি কোথাও যেওনা।

বেশ।

কলকাতাতে থাকলে সর্বদা তোমার 'পরে আমার নজর রাখবার সুবিধা হবে।

তাহলে যাবো না?

না। কিন্তু ইউ মাস্ট টেক্ ইট্ ইজি! কোনরকম ব্রুড করতে পারবে না।

বেবী জবাবে এবার মৃদু হাসলো মাত্র।

আমি এবার তাহলে উঠি।

উঠবেন?

হ্যাঁ, কিন্তু একটা কথা, প্রয়োজনে আমাকে ফোন করে জানাতে কিন্তু এতটুকুও দ্বিধা করবে না আজকের মত, মনে থাকবে তো কথাটা?

থাকবে।

হ্যাঁ, ডোণ্ট্ হেসিটেট্।

॥ একুশ ॥

দক্ষিণেশ্বরে একেবারে গঙ্গার কোল ঘেঁষে দোতলা একটি বাড়ী। বাড়ীটার সামনে প্রায় ১০।১২ কাঠা জমি নিয়ে বিরাট একটি বাগান। নানা প্রকারের ফল ফুল ইত্যাদির গাছে সত্যিই বাগানটির মধ্যে একটি শান্ত নির্জনতা যেন দানা বেঁধে উঠেছে। মধ্যে মধ্যে বেঞ্চ পাতা, উলঙ্গ পরীর মর্মর মূর্তি। বাড়ী ও তৎসংলগ্ন বাগানটি এককালে একজন মাড়োয়ারীর ছিল এবং তারও আগে যে কার ছিল বলা দুষ্কর। কেউ কেউ বলে লর্ড ক্যানিংয়ের আমলের বাড়ী। কিছু দিন হলো 'মতিঝিলে'র অধিকারী সন্তোষ মিত্র ক্রয় করে নিয়েছেন এবং বাড়ীটার মধ্যে অনেক অদল বদল করে তার সৌন্দর্য যেন অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছেন। বাড়ীটা অনেক দিনের পুরানো হওয়ায় এবং নিয়মিত ব্যবহৃত হতো না বলে সব কিছুই বাড়ীটার জীর্ণ হয়ে এসেছিল।

প্রচুর অর্থ ব্যয় করে সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে প্ল্যান করিয়ে বাড়ীটার আমূল সংস্কার সাধন করেছেন সন্তোষ মিত্র। বাড়ীটা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এখন তিনজন মালী, দুজন দারোয়ান ও একজন পাঞ্জাবী কেয়ার টেকার নিযুক্ত করা হয়েছে। দোতলায় ও তিনতলায় চারখানি করে বড় বড় আটখানা ঘর। দোতলার সামনের দিকে গঙ্গার দিকে মুখ করে মস্ত বড় টানা বারান্দা। মধ্যে মধ্যে ইদানীং সন্তোষ মিত্রের ঐ বাড়ীটায় একদল কলেজের ছেলে মেয়ে এসে একদিন দুদিন হৈ-হল্লা, স্ফূর্তি করে যায়।

কি একটা পর্ব উপলক্ষে কলেজে পর পর দুদিন ছুটি। সেই ছুটিকে উপলক্ষ করেই সন্তোষ মিত্র একদল তার অনুরাগী ও অনুরাগিনী কলেজের তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এসেছিলেন ঐ বাড়ীতে। এবং সেই দলের মধ্যে ছিল এক পাঞ্জাবী তরুণের ছদ্মবেশে সুব্রত রায়। নাম নিয়েছিল রঞ্জিৎ সিং। সে এসেছিল ঐ দলেরই একজন পাঞ্জাবী ছাত্রী রমা কাউরের বন্ধু হিসেবে। মাথায় পাগড়ি, চোখে চশমা ও স্যুট পরিহিত, মুখে দাড়ি সুব্রতকে চিনবারও উপায় ছিল না কারো।

সুব্রত ছাড়াও দলের মধ্যে ছিল নির্মল চৌধুরী। সে কিন্তু ছাত্র ছাত্রীদের দলে ছিল না। একজন ছাত্রের ভৃত্য হিসাবে সে এসেছিল ভৃত্যের ছদ্মবেশে।

আরো পরিচিতের মধ্যে ছিল করবী, বেবী ও বিনয়েন্দ্রের অফিসের সুপারভাইজার, ম্যানেজার বা বিনয়েন্দ্রের সর্বব্যাপারে দক্ষিণ হস্ত মনোহর শিকদার।

একটা রাত ও দুটো দিন সকলেই ওখানে থাকবে। তাই উপরের চারখানা ঘরে আলাদা আলাদা ভাবে ছেলে ও মেয়েদের থাকবার ব্যবস্থাও হয়েছিল।

বেলা সাড়ে ন'টা হবে তখন। রঞ্জিৎ সিং ছদ্মবেশী সুব্রত গলায় একটা রোলিফ্লেক্স্ ক্যামেরা নিয়ে দোতলার সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

বাগান পার্টির উদ্যোক্তা স্বয়ং সন্তোষ মিত্র এখনো এসে ওখানে পৌঁছাননি। বারান্দার এদিকে ওদিকে সব ডেক্ চেয়ার পাতা। সমাগতের দল কেউ কেউ সেই চেয়ারে বসে, আবার কেউ কেউ দাঁড়িয়ে হাসি গল্প করছে।

সুব্রত দেখল বারান্দার একপাশে দামী স্যুট্ পরিহিত মনোহর শিকদার একটি তরুণীর সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নিম্ন কণ্ঠে হেসে হেসে কি যেন আলাপ করছে।

সুব্রত মুহূর্তে কি ভেবে ক্যামেরাটা রেডি করে মনোহর শিকদার ও তার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হাসি গল্পেরত তরুণীটির একটি স্ন্যাপ নিয়ে নিল।

হঠাৎ একসময় সুব্রতর নজরে পড়লো বারান্দার রেলিংয়ে হাত রেখে দূরে গঙ্গার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে বেবী। পরিধানে সাদা জর্জেট গায়েও সাদা জর্জেটের ফুল হাতা ব্লাউজ। মাথায় চুল এলোমেলো খোঁপা করা সুব্রত কি ভেবে দু'পা এগিয়ে যায় বেবীর দিকে আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটি তরুণী এগিয়ে এসে ইংরাজীতে বলে, গঙ্গার স্ন্যাপ নিলেন বুঝি মিঃ সিং?

হ্যাঁ।—মৃদু হেসে ইংরাজীতেই জবাব দেয় সুব্রত।

কি ক্যামেরা ওটা আপনার?

রোলি ফ্লেক্স্।

ঐ সময় সুব্রত লক্ষ্য করে বেবী তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

বাড়ীটার পিছন দিকে গঙ্গার পাড়ে বহু প্রাচীন এক বৃক্ষ শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে জায়গাটিকে ছায়া-শীতল করে রেখেছে। বিরাট বিরাট শিকড়গুলো মাটির বুকে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিড় এড়িয়ে করবী সেই বটবৃক্ষের নিচে মোটা একটা শিকড়ের উপর একাকী চুপটি করে বসে ছিল। এবারকার পার্টিতে করবীর আদৌ আসবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সুব্রত বিশেষভাবে ওঁকে টেলিফোনে আসবার জন্য অনুরোধ করায় ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও ও এসেছে। অথচ সুব্রত টেলিফোনে ওকে বলেছিল, সেও এখানে আসবে, কিন্তু এখনও তার দেখা নেই।

করবী।

কে? চমকে ফিরে দেখে করবী পিছনে দাঁড়িয়ে সন্তোষ মিত্র।

সন্তোষবাবু! কখন এলেন আপনি?

এই তো কিছুক্ষণ।

টের পাইনি তো?

টের পেতে হলে যে মনের দরকার, মনের সে অবস্থা কি তোমার আছে করবী যে কারো আসা যাওয়া এত সহজে টের পাবে। কিন্তু সত্যি বলছি, এখনো কেন সেই পুরোনো কথা নিয়ে মন খারাপ করো বলতো।

পুরানো কথা!

তা নয়ত কি। তুমি কি মনে করো যে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে সে আর কখনো ফিরে আসবে। তাছাড়া কি ছিল তার। তুমি কি এতই সহজলভ্যা যে নির্মলের মত অতি সাধারণ একজন ছেলে—

ওসব কথা থাক সন্তোষবাবু।

না, কেন থাকবে? কি এমন মহামূল্যবান বস্তু তুমি হারিয়েছ যার জন্যে জীবনের সমস্ত আনন্দকে এইভাবে বিসর্জন দিয়ে তোমাকে যৌবনে যোগিনী সাজতে হবে! না, না—রুবি, এভাবে তুমি তোমার আত্মাকে পীড়ন করো না, করা তোমার উচিত নয়। মানুষের জীবনটা এতো ছোট নয় রুবি যে, একজনের অভাবে তাকে এমনি করে সর্বস্ব ত্যাগের বৈরাগ্যের দুঃসহ কৃচ্ছ্র সাধন করতে হবে।

সন্তোষ মিত্রের শেষের কথাগুলোতে কণ্ঠস্বরে এমন একটা আবেগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে চমকিত করবী তাঁর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে না তাকিয়ে পারে না। সহসা পরমুহূর্তেই এগিয়ে এসে সন্তোষ মিত্র করবীর একখানা হাত ধরে উঠবার জন্য ঈষৎ আকর্ষণ করে বলে ওঠেন, চল, ওঠো—জীবন শোকের নয়, আনন্দের।

আঃ ছাড়ুন মিঃ মিত্র।—হাতটা ছাড়িয়ে নিল করবী। এবং হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে আর মুহূর্তমাত্রও সেখানে দাঁড়ালো না করবী। দ্রুতপদে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

তার ক্রমঅপসৃয়মান দেহটার দিকে তাকিয়ে প্রথমে মুহূর্তের জন্য সন্তোষ মিত্রের মুখভাব ক্রোধে আরক্তিম হয়ে ওঠে। পরক্ষণেই ক্রোধ মিলিয়ে গিয়ে ওষ্ঠপ্রান্তে নীরব এক ক্রুর হাসি ফুটে উঠলো।

আর সেই সময় বেবী গঙ্গার একেবারে কোল ঘেঁষে যেখানে মস্ত বড় একটা পাথর পড়ে ছিল, সেই পাথরের উপর সামনের গঙ্গার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে একাকী দল ছাড়া হয়ে বসে ছিল। সুব্রতর অনুরোধে এখানে সে এসেছে বটে কিন্তু এক মুহূর্তও যেন তার থাকতে আর মন চাই ছিল না। আজকের রাতটা কোনমতে কাটাতে পারলেই কাল প্রত্যুষেই সে চলে যাবে

মনে মনে স্থির করে রেখেছে।

গঙ্গায় বোধহয় জোয়ার লাগলো। ঘোলা জলের স্ফীতি একেবারে হাতখানেকের মধ্যে এসে পড়েছে। গেরুয়া বর্ণের পাল তুলে মস্ত বড় মহাজনী নৌকটা ভেসে চলেছে জোয়ারের টানে টানে। দোতলা থেকে অনেকগুলো কণ্ঠের মিলিত একটা গানের সুর ভেসে আসছে। সহসা কার চাপা সতর্ক কণ্ঠস্বর যেন ওর কানে এলো।

বেবী!

চমকে ফিরে দেখে বেবী, পশ্চাতে তার দাঁড়িয়ে রঞ্জিৎ সিং।

সুব্রতবাবু!

বেবীর মুখে নিজের নামটা শুনে একটু যেন চম্‌কেই ওঠে সুব্রত। এদিক ওদিক সতর্ক তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে নিয়ে পূর্ববৎ চাপা নিম্ন কণ্ঠে বলে, চুপ্—আস্তে—

বসুন—বেবী তার পাথরের একটা অংশ দেখিয়ে ওকে বসাবার জন্য আহ্বান জানায়।

না, বসবো না। তুমি আমাকে চিনতে পেরেছো তাহলে?

বেবী ওর কথার কোন জবাব দিল না। শুধু একটু হাসলো মাত্র। ক্ষণেকের জন্য মনে হয় বুঝি বেবীর, চিনতে তোমাকে পারবো না কেমন করে একথা বললে। যে মূর্তি হৃদয়ের সর্বত্র ছায়া ফেলেছে, যে কণ্ঠস্বর দু'কান ভরে অহোরহ দূরাগত সঙ্গীতধ্বনির মতই বাজছে। কিন্তু না, সে কথা তো বলবার নয়। কাউকেই তো জানাবার নয়।

মৃদু কণ্ঠে বেবী বলে, কি ভেবেছিলেন আপনি?

কিন্তু····

বাধা দিয়ে বেবী এবারে বলে, প্রথম দেখে ও আপনার গলার স্বর শুনেই চিনতে পেরেছি—

যাক্ সে কথা। একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলবার জন্যই তোমাকে কাল থেকে একলা খুঁজছিলাম—

একলা খুঁজছিলেন?

হ্যাঁ, আজকের রাতটা তোমাকে খুব সাবধানে থাকতে হবেই, আর—

আর—

আর ঐ করবীদেবীর ওপর তোমাকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখতে হবে।

করবীদেবীর ওপর?

হ্যাঁ।

কিন্তু ব্যাপার কি মিঃ রায়?

সব কথা পরে, জানবে। শুধু যা বললাম মনে থাকে যেন।

বেশ।

লক্ষ্মী মেয়ে। আচ্ছা, আমি চললাম।—সুব্রত দ্রুতপদে চলে গেল।

॥ বাইশ ॥

নিচের তলার ঠিক সিঁড়ির মুখেই যে ঘরের দরজাটা, সুব্রত বারান্দা দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগুতে গিয়ে সেই দরজার দিকে দৃষ্টি পড়তেই থমকে দাঁড়ালো। দীর্ঘ স্যুট পরিহিত এক ব্যক্তি বদ্ধ ঘরের দরজার দুই কবাটের মধ্যবর্তী ফাঁক দিয়ে চট করে কি যেন একটা সাদা খামের মত ঘরের মধ্যে ফেলে দিয়ে পাশের হলঘরে ঢুকে গেল ত্বরিৎপদে। এখানে আসা অবধি সুব্রত লক্ষ্য করেছিল নিচের তলার ঐ ঘরটির দরজায় শিকল তোলা। ঐ ঘরটিতে কেউ প্রবেশ করে না।

দেওয়ালের গা ঘেঁষে সুব্রত নিজেকে আত্মগোপন করেছিল। স্যুট পরিহিত ব্যক্তিটি পিছন ফিরে তাকায়। সুব্রত তাকে চিনতে পারেনা। কয়েক মুহূর্ত মনে মনে ভাবে, কে হতে পারে লোকটি। এখানে সদ্য উপস্থিত যারা সকলকেই মনে মনে একবার ভেবে নিল সুব্রত কিন্তু কারো সঙ্গেই যেন ক্ষণপূর্বে পিছন দিক হতে দৃষ্ট লোকটিকে সনাক্ত করতে পারলো না। কিন্তু পরক্ষণেই এদিক ওদিক একবার তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে নিল। নিচে তখন কেউ নেই। সকলেই উপরে জটলা পাকাচ্ছে। তাদের হৈ-হল্লা ও গান শোনা যাচ্ছে।

কৌতূহলী সুব্রত এগিয়ে গিয়ে চট্ করে শিকল খুলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ভিতর দিক থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। ঘরটা খালি। একপাশে একটা বড় কাঠের দেওয়াল আলমারি ও একটা ড্রেসিং টেবিল মাত্র। ঘরের মেঝেতে পুরু কার্পেট বিছানো।

দরজার সামনেই মেঝেতে কার্পেটের উপরে নজর পড়লো সুব্রতর, একটা সাদা খাম পড়ে আছে। নিচু হয়ে খামটা তুলে নিল সে। মুখটা খোলা খামের। সন্তর্পণে খামের ভিতর থেকে চিঠির একটা কাগজ বের করলো সুব্রত।

অপূর্ব, প্রস্তুত থেকো। রাত বারটার পর। 'রুইতন'।

আশ্চর্য! এ সেই হস্তাক্ষর। সেই অপূর্ব! খামের মধ্যে চিঠিটা যেমন মেঝেতে পড়েছিল তেমনি ফেলে রেখে সুব্রত ঘর থেকে বের হয়ে এসে আবার শিকল তুলে দিল।

মুহূর্তকাল কি যেন ভেবে নিল সে। তারপরই গেটের পাশে গ্যারেজের দিকে এগিয়ে চললো। গ্যারেজের কাছাকাছি গিয়ে ও দেখতে পেল একটা গাড়ি গেট দিয়ে বের হয়ে চলে গেল। দূরে থেকে চলন্ত গাড়ির নম্বরটা দেখে সুব্রত চম্‌কে ওঠে। সন্তোষ মিত্রের গাড়ি। সন্তোষ মিত্র কি তবে ইতিমধ্যে একসময় এসেছিল। আর এসেছিলই যদি তো চলে গেল কেন?

চিন্তিত সুব্রত নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। এখানে আসবার সময় গতকাল নিজের গাড়িটা আনেনি। এনেছিল তারই এক বন্ধুর গাড়িটা দিন দুয়েকের জন্য চেয়ে। সুব্রত গাড়িতে উঠে বসে ষ্টার্ট দিল।

বেলা তখন গোটা সাড়ে বারো হবে। হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে ঘোষ এণ্ড কোম্পানির বিরাট অফিসের সামনে সুব্রত এসে গাড়িটা থামালো। ফুটপাতের ধারে যেখানে গাড়ির পার্কিং সেখানে গাড়িটা পার্ক করে গাড়ি থেকে নেমে অফিসের গেটের দিকে অগ্রসর হলো সে। লিফ্‌টে করে তিনতলায় উঠে এলো।

বিরাট হলঘরের চারিদিকে সব টেবিল চেয়ার পাতা। প্রায় সাত আটশত কর্মচারি যে যার কাজে ব্যস্ত। বহু কণ্ঠের মিলিত একটা গুঞ্জন ও টাইপ রাইটারের খট্‌ খট্‌ শব্দ একটানা শোনা যাচ্ছে। এন্‌কোয়ারীতে জিজ্ঞাসা করে সুব্রত ম্যানেজিং ডাইরেকটারের অফিসের দিকে এগিয়ে গেল। ঝক্‌ঝকে বার্মা টিক উডের ভেজানো দরজার সামনে একজন বেয়ারা বসে ছিল।

কিসকো মাঙ্গতেহে সাব।

বলা বাহুল্য সুব্রত ইতিমধ্যে বাড়ীতে গিয়ে তার বেশভূষা বদল করে এসেছিল।

ম্যানেজিং ডাইরেকটার সাব্‌কো সাথ ভেট মাঙ্গতে হে—

সাব তো আভি অফিস্‌ মে নেই আয়া হ্যায় সাব্‌!—

লেকেন হামারা সাথ ইসি বখত জরুরী এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট থা সাব্‌কো।

তো যাইয়ে না, ওয়েটিং রুমমে বৈঠিয়ে না।

না বসবো না। এখানে একজন বাবুর সঙ্গে আমার দেখা করবার আছে দেখা করে আসি—সুব্রত একটু এগিয়ে গেল। এগিয়ে গেলেও সুব্রত আড়চোখে বেয়ারাটার উপর নজর রাখলো যদি কোন এক সময় বেয়ারাটা মুহূর্তের জন্যও ঐখান থেকে সরে যায় তো ও একবার এ্যাটেম্পট্‌ নিয়ে দেখতো যদি অফিস ঘরটা খোলা পায় ম্যানেজিং ডাইরেকটারের।

বেশীক্ষণ সুব্রতকে অপেক্ষা করতে হলো না। একটা বাজতেই অফিসের টিফিনের সময় এসে গেল। বেয়ারাটা টুল ছেড়ে উঠে গেল। সুব্রত ঐ সুযোগ হেলায় হারালো না। চট করে এক সময় অফিস ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বরাত ভালো সুব্রতর। দরজাটা খোলাই ছিল। ঠেলতেই খুলে গেল এবং সেও চট করে অফিস ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

ম্যানেজিং ডাইরেকটার বিনয়েন্দ্রনাথের ঐ সময় অফিসে আসবার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ বেবীর মুখেই সে শুনেছে বিনয়েন্দ্র ধানবাদ গিয়েছেন এবং ফিরবেন দিন দশেক বাদে।

চমৎকার সাজানো গোছানো অফিস ঘরটি।

বিরাট একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল। একটি গদী মোড়া দামী রিভলভিং

চেয়ার। একপাশে দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাড় করানো মস্ত বড় একটা ষ্টিলের আলমারি। একটি হ্যাট ও কোট রাখবার র‍্যাক তার পাশেই।

এদিক ওদিক তাকাতেই সুব্রতর নজর পড়লো ঘরের মধ্যে আরো দুটি দরজা দুদিকে প্রথম দরজাটা ঠেলে খুলতেই দেখলো সেটা প্রিভি দ্বিতীয় দরজাটা ঠেলে খুলতেই অপেক্ষাকৃত একটি ছোট ঘর চোখে পড়লো। এবং সেটাও যে একটা অফিস রুম দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না। সে ঘরের মধ্যেও তখন কেউ ছিল না।

সুব্রত ঘরের মধ্যে পা দিল দরজা পথে! মাঝারি গোছের একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল, একখানি চেয়ার, টেবিলের 'পরে ফোন। ঘরের একপাশে একটি ছোট টেবিলের 'পরে একটি টাইপ রাইটিং মেসিন, তার পাশে একটি ষ্টিলের আলমারি মাঝারি সাইজের। এ ঘরের সংলগ্নও যে একটি বাথরুম আছে ঘরের মধ্যস্থিত আর একটি দ্বার দেখেই সেটা বুঝতে পারে সুব্রত। এগিয়ে গেল সুব্রত টাইপ রাইটিং মেসিনটা যে টেবিলের 'পরে ছিল সেটার সামনে।

পাশেই কয়েকটা কাগজ রাখা আছে টাইপ করা। অন্যমনস্ক ভাবেই সুব্রত একটা টাইপ করা কাগজ টেবিলের 'পর থেকে তুলে নিল। অফিস গোডাউনের একটা স্টেটমেণ্ট।

সহসা স্টেটমেণ্টটা দেখতে দেখতে টাইপ করা অক্ষরগুলোর মধ্যে একটা বিশেষত্ব সুব্রতর তীক্ষ্ন দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। অক্ষরগুলোর মধ্যে ক্যাপিটাল 'ই' ও 'এন্' লেটারগুলো অস্পষ্ট। 'ই' ও 'এন্' অক্ষর দুইটি ভাঙ্গা। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় মাত্র আগের দিন সন্ধ্যার সময় কিরীটির বাসায় বসে ঘোষনিবাসে নরেন্দ্রনাথের মৃতদেহের পাশে আকুস্থান 'সামার হাউসের' বেঞ্চের 'পরে যে এ্যাবার্ডিন থেকে ইংরাজীতে টাইপ করা চিঠিটা পাওয়া গিয়েছিল, সেই চিঠির সম্পর্কেই কিরীটি বলেছিল, চিঠির টাইপে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিস কিনা জানিনা সুব্রত। টাইপের বড় হাতের 'ই' ও 'এন্' অক্ষরগুলো ভাঙ্গা।

উত্তেজিত সুব্রত এবারে টাইপ রাইটিং মেসিনের 'ই' ও 'এন্' অক্ষর দুটো পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলো অক্ষর দুটোই ভাঙ্গা।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের দরজা খুলে গেল। ঘরে প্রবেশ করলো মনোহর শিকদার।

কে ?

সুব্রত ঘরের মধ্যে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল তাই প্রথমটা চিনতে না পেরে সম্পূর্ণ একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে তার প্রাইভেট অফিস ঘরে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। সুব্রত ততোক্ষণে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

নমস্কার মিঃ শিকদার।

হু দি ডেবিল ইউ আর! কে আপনি? হাউ কুড্ ইউ গেট ইন্ হিয়ার?

আমার নাম সুব্রত রায়।

সুব্রতবাবু!···কিন্তু কার হুকুমে এ ঘরে আপনি ঢুকলেন?—বলে শিকদার এগিয়ে গিয়ে টেবিল সংলগ্ন কলিং বেলটা বাজাতে যাবেন, সুব্রত তাকে বাধা দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললে, একটু অপেক্ষা করুন মিঃ শিকদার, কলিং বেল টিপে বেয়ারাকে এ ঘরে ডেকে আনলে আপনারই অসুবিধা হবে। আপনিই বিব্রত হবেন।

বিব্রত হবো!

হ্যাঁ, কারণ আপনার এই ঘর এখন সার্চ করবার জন্য পুলিশকে ফোন করি—এবং তারা এসে সার্চ করে এমন কোন মারাত্মক প্রমাণ যদি পায় এই ঘরে—

মারাত্মক প্রমাণ! হোয়াট্ ডু ইউ মিন?

আই মিন, সেই প্রমাণ যদি এমন হয় যে, মৃত নরেন্দ্রনাথ ঘোষের, এই অফিসের পূর্বতন মালিক—তাঁর হত্যা-রহস্যের ফেভারে যায় তো বুঝতেই, পারছেন ব্যাপারটা খুব সুবিধার হবে না তখন। তার চাইতে মিথ্যে একটা কেলেঙ্কারীর চেষ্টা না করে যদি সামনের ঐ চেয়ারটায় বসেন এবং আমি যা জিজ্ঞাসা করি তার জবাব দেন—

সুব্রতর শেষের কথাগুলো মনোহর শিকদারকে যে বেশ একটু বিচলিত করে দেয় সেটা সুব্রতর বুঝতে তেমন কষ্ট হয় না। কারণ পরমুহূর্তেই কথা বলতে গিয়ে মনোহরের গলাটা একটু কেঁপে ওঠে। এবং তার চোখে মুখেও একটা সুস্পষ্ট বিহ্বলতা প্রকাশ পায়, সে তখন বলে, এসব কি বলছেন আপনি!

সুব্রত এবারে মনে মনে হেসে তার চরম অস্ত্রটি প্রয়োগ করে।

শান্ত কঠিন কণ্ঠে বলে, বলছি, ঐ যে আপনার ঘরে টাইপ রাইটিং মেসিনটি টেবিলের 'পরে রয়েছে ওইটিই প্রমাণ করবে হতভাগ্য নরেন্দ্রনাথ ঘোষের হত্যার প্রস্তুতির একেবারে মোক্ষম নিদর্শন।

মোক্ষম নিদর্শন! কি সব প্রলাপ বকছেন আপনি?

প্রলাপই বটে! তবে আদালত ঐ প্রলাপ থেকেই যখন আপনাকে নরেন্দ্রনাথের হত্যার অন্যতম সাহায্যকারী বলে কাঠগড়ায় টেনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাবে—

এতক্ষণে সত্যি সত্যিই মনোহর শিকদার সামনের চেয়ারটার উপরে বসে পড়লেন।

আরো নির্মম কণ্ঠে সুব্রত এবারে বলে, আরো বিশদ ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি মিঃ শিকদার। এ্যাবার্ডিনের এক বিলিতী কোম্পানির নাম দিয়ে নরেন্দ্রনাথের ফটো তোলার নেশাকে উদ্রিক্ত করে ইংরাজীতে টাইপ করে যে, চিঠির ফাঁদ

পেতেছিলেন, সে চিঠিটা যে আপনার ঐ টাইপ রাইটারেই টাইপ করা হয়েছিল সেটা প্রমাণ করবে ঐ মেসিনটিরই ভাঙ্গা 'ই' ও 'এন্' ইংরাজী অক্ষর দুটি। আশা করি এবারে বক্তব্যটা আমার বুঝতে আর আপনার কষ্ট হচ্ছে না!—তারপর একটু থেমে সুব্রত বলে, কলিং বেল টিপে এবারে ডাকবেন নাকি আপনার বেয়ারাকে মিঃ শিকদার।

মনোহর শিকদার এবারে একেবারে নিশ্চুপ। বোবা অসহায় আতঙ্কিত দৃষ্টি ফুটে ওঠে তার দু'চোখে।

আর আশা করি এটাও আপনার অজানা নেই যে, হত্যা যে করে ও সেই হত্যার ব্যাপারে যে সাহায্য করে উভয়েই মার্ডার ও এ্যাবেট্‌মেণ্ট অফ মার্ডার আইনের চোখে সমান অপরাধী মিঃ শিকদার।

আমাকে বাঁচান সুব্রতবাবু!—সহসা যেন ভেঙ্গে পড়লেন মনোহর শিকদার।

বাঁচাবার চেষ্টা করতে পারি যদি আপনি আমার সমস্ত প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দেন।

বলবো, নিশ্চয়ই যতটা আমার জানা আছে আমি বলবো।

বেশ, তবে বলুন নরেন্দ্রনাথকে ফটো তোলবার জন্য ডাকে ফিল্ম স্পুলটা কে পাঠিয়েছিল?

বিশ্বাস করুন সুব্রতবাবু, সত্যিই তা আমি জানি না।

জানেন না। এখনো চাতুরী খেলবার চেষ্টা করছেন?

ঈশ্বরের দোহাই! বিশ্বাস করুন, সত্যি বলছি ফিল্ম সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

কিছুই জানেন না?

না।

বেশ! আপনার এ অফিসে সত্যিকারের ফাংসনটা কি? না সেটাও জানেন না?

আমি—

বলুন।

সন্তোষ মিত্রের রিপ্রেজেনটেটিভ্ হিসাবে এখানে আমি কাজ করি।

সন্তোষ মিত্র! মানে মতিঝিলের?

হ্যাঁ।

তাঁর এ অফিসের সঙ্গে সম্পর্ক কি?

তিনি এ অফিসের একজন মেজর শেয়ার হোল্‌ডার বলেই আমি জানি।

আই-সি। আচ্ছা সন্তোষ মিত্র সম্পর্কে আপনি কতটুকু কি জানেন?

বিশ্বাস করুন তাঁর সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছুই জানিনা।

কিছুই একেবারে জানেন না। তাঁর বাড়ী ঘর দোর, মতিঝিলে আবির্ভূত

হবার আগে তিনি কোথায় ছিলেন ?

না।

হুঁ, আচ্ছা অপূর্ববাবু নামে কোন ব্যক্তি বিশেষ কে আপনি জানেন ?

না। —একটা ঢোক গিলে কথাটা কোনমতে উচ্চারণ করে শিকদার।

জানেন না। সত্যি বলছেন ?

হ্যাঁ, সত্যিই বলছি।

হুঁ। রুইতন বলে কোন নাম আপনি কখনো শুনেছেন বা জানেন ?

রুইতন।

হ্যাঁ—

না।

হুঁ। রুইতন নামটিও শোনেননি তাহলে। বেশ! গত শনিবার রাত্রে চায়না হোটেলে যে তরুণীটি আপনার সঙ্গে ছিল সে কে ?

কি বলছেন আপনি সুব্রতবাবু। গত শনিবার রাত্রে মাথার অসহ্য যন্ত্রণায় বাড়ী থেকে মোটে আমি বেরই হইনি—

আপনি বেরই হননি ?

না।

সুব্রত আর কোন কথা না বলে নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিতে যেতেই ব্যাকুল আর্তকণ্ঠে মনোহর শিকদার বলে ওঠে, ওকি সুব্রতবাবু—

হ্যালো, পুট মি টু পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স—

সুব্রত মনোহরের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, চুপচাপ বসে থাকেন যদি তো কোন কেলেঙ্কারীই হবে না। নচেৎ অপমানের একশেষ হবেন মিঃ শিকদার।

মনোহর অতঃপর সুব্রতর কাজে আর বাধা দেয় না। নিঃশব্দে চেয়ারটার উপর বসে থাকে। সুব্রত তখন ফোনে বলে চলেছে, হ্যালো, কে সোম। হ্যাঁ আমি সুব্রত কথা বলছি। এখুনি একটা জীপে করে কয়েকজন আর্মড প্লেন ড্রেসে পুলিশ পাঠান। আপনি আসছেন—বেশ তো আসুন—

সুব্রত ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিল।

মিঃ রায়—

বললাম তো মিঃ শিকদার, কোন রকম কেলেঙ্কারীই করবো না আমি। নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীনাথ করের হত্যা রহস্যের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কেবল আপনাকে থানায় নজরবন্দী হয়ে থাকতে হবে।

কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন সুব্রতবাবু, ওদের দুজনার একজনকেও আমি হত্যা করিনি।

সেটা আদালতই বিচার করবে। আমার কিছুই করবার নেই। সত্যিই

যদি তাদের বিচারে আপনি নির্দোষ প্রমাণিত হন তাহলে সসম্মানে আপনি মুক্তি পাবেন বৈকি! তবে যতক্ষণ না সেটা প্রমাণিত হচ্ছে, কষ্ট আপনাকে একটু ভোগ করতেই হবে। কিন্তু ওরা আসবার আগে যদি একটা প্রশ্নের জবাব দেন, সন্তোষ মিত্র মহাশয়ের সঙ্গলাভ কতদিন আপনার ঘটেছে।

ওর কাছে আমি বছর চারেক কাজ করছি।

তার আগে কোথায় ছিলেন!

সেটা জেনে আপনার কোন লাভ নেই।

বলবেন না এই তো। বেশ! কিন্তু সন্তোষ মিত্রের আসল ও সত্যিকারের পরিচয়টা আপনি জানেন কি!

জানি। এককালে তিনি পূর্ববঙ্গের জমিদার ছিলেন।

কিন্তু আমি যদি বলি কোন কালেই তিনি জমিদার ছিলেন না।

তাহলে আর আমাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করছেন কেন!

জিজ্ঞাসা করছিলাম এই জন্য যে—সুব্রতর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দরজার গায়ে নক্ শোনা গেল।

উজ্জ্বল আলোয় সন্তোষ মিত্রের দক্ষিণেশ্বরের বাগানবাড়ীটা ঝলমল করছিল সে রাত্রে। দোতালার হলঘরে ফরাস পেতে একটা ঘরোয়া গান বাজনার আসর বসেছে। কলকাতা থেকে বিখ্যাত কয়েকজন গায়ক গায়িকা এসেছে। বিখ্যাত ঠুংরী গায়ক নুরুল্লা খান গান ধরেছেন। মুগ্ধ শ্রোতারা সব ঘরের চারিদিকে ছড়িয়ে বসে গান শুনছে একমনে। করবীও ছিল শ্রোতাদের মধ্যে একপাশে।

পাশের একটি মেয়ে করবীর গায়ে মৃদু অঙ্গুলি স্পর্শ করে বললে, তোমাকে কে বাইরে ডাকছে করবী।

করবী অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাইরের বারান্দায় উঠে এলো।

একজন ভৃত্য দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়। সে করবীকে বলল, আপনার বাবা রমেন্দ্রবাবু আপনাকে এখুনি একবার নিচেয় ডাকছেন—

কে, বাবা!—চমকে ওঠে করবী।

এত রাত্রে তার বাবা এখানে! সে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় তিনি?

নিচের ঘরে অপেক্ষা করছেন।

একটু যেন বিস্মিত হয়েই করবী সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যায়। ভৃত্যও নামে পিছনে পিছনে অনুসরণ করে তাকে।

এবং যে ঘরটা নিচের সর্বদা বন্ধই থাকতো, সেই ঘরের দিকেই নির্দেশ করে ভৃত্য বললে, ঐ যে, ঐ ঘরে যান, ওই ঘরেই আপনার বাবা আছেন।

করবী সামনের ঘরের বন্ধ দরজাটা ঠেলতেই সেটা খুলে গেল এবং সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই মুহূর্তে দপ্ করে ঘরের আলোটা গেল নিভে এবং

সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে কোন কিছু বুঝে উঠবার আগেই লোহার সাঁড়াশীর মত কঠিন নির্মম দুটো হাত করবীকে জাপটে ধরে তার মুখটা চেপে ধরলো।

করবী কিছু বুঝতে পারলো না, সামান্যতম শব্দ পর্যন্ত করবারও যেন অবকাশ পেল না। কেবল একটা শ্বাসরোধকারী মিষ্টি গন্ধ তার সমগ্র চেতনা ও স্নায়ুকে যেন ধীরে ধীরে অবশ, সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে ফেললো সীমাহীন অন্ধকারে একটা নিশ্চিত ঘুমের অতলান্ত সমুদ্রের মধ্যে যেন তলিয়ে গেল করবী ধীরে ধীরে।

ঘরের মধ্যে এক পাশে দেওয়াল ঘেঁষে যে আলমারিটা দাঁড় করানো ছিল অন্ধকারে, সেটার বন্ধ কপাট দুটো খুলে গেল। এবং বোঝা গেল সেটা আলমারি নয়, ঘর থেকে বের হয়ে যাবার অন্য একটি দ্বারপথ। গুপ্ত দ্বারপথ। জ্ঞানহীন করবীর দেহটা কাঁধে করে দীর্ঘকায় ছায়ামূর্তি সেই দ্বারপথে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল অন্ধকারেই। এবং বের হয়ে যাবার পূর্বে আলমারির কপাট দুটো আবার ওদিক থেকে টেনে বন্ধ করে দিয়ে গেল।

বাগানবাড়িটা ছাড়িয়ে বড় রাস্তাটা কিছুটা এগিয়ে ডান দিকে বাঁক নিয়েছে এসে একটা অপ্রশস্ত কাঁচা মাটির রাস্তায়। সেই রাস্তার উপরেই একটা বড় শাখাপ্রশাখা বহুল আমগাছের নিচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল একটা বিরাট কালো রংয়ের ডিসোটা গাড়ি।

একেই জায়গাটা সন্ধ্যার পর থেকে নির্জন হয়ে পড়ে, তার উপরে মধ্য-রাত্রির অন্ধকারে যেন কবরখানার মত একটা ভয়াবহ ভৌতিক স্তব্ধতা নেমে আসে। থমথমে কালো অন্ধকারের মধ্যে কেবল আমগাছটার পাতাগুলো মধ্যে মধ্যে হাওয়ায় সিপ সিপ একটা শব্দ তুলেই থেমে যায়। একটি লোক গাড়ির ড্রাইভিং সিটে চুপটি করে বসে ছিল। মধ্যে মধ্যে অন্ধকারে শ্যেন দৃষ্টি মেলে পশ্চাতের দিকে তাকাচ্ছিল যেন কিসের প্রতীক্ষায়।

গাড়ির মধ্যে উপবিষ্ট লোকটা কিন্তু জানতো না যে ঐ আমগাছটার অল্পদূরে ঠিক ঐ সময় আর একজোড়া চোখের তীক্ষ্ন সজাগ দৃষ্টি ঐ গাড়িটার প্রতি লক্ষ্য রেখেছে, পথের পাশে বনমল্লিকার ঝোপের আড়াল থেকে নিজেকে আত্মগোপন করে। প্রচন্ড মশা ঝোপের মধ্যে। এবং পরমানন্দে মশা-গুলো লোকটার চোখে মুখে দংশন করে চলেছে, তবু যেন লোকটার কোনরূপ ধৈর্যচ্যুতি নেই।

একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে একসময় সচকিত হয়ে ওঠে সেই ঝোপের মধ্যে আত্মগোপনকারী লোকটি। একটা জুতোপরা পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। শব্দটা ঐ দিকেই এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ, তার অনুমান মিথ্যা

নয়। অত্যন্ত অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তি গাড়িটার দিকেই এগিয়ে আসছে। হঠাৎ ঐ সময় গাড়ির ভিতরের আলোটা জ্বলে উঠলো দপ্ করে। এবং সেই আলোয় ও দেখলো, চাদরে আবৃত একটা অচৈতন্য দেহ, একজন লোক কাঁধের উপরে ফেলে গাড়ির খোলা দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে।

অচৈতন্য দেহটা, লোকটা অতঃপর গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতেই গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল ও সঙ্গে সঙ্গে আলোটাও দপ্ করে নিভে গেল। তারপরই শোনা গেল গাড়িতে স্টার্ট দেবার শব্দ।

গাড়িটা ছেড়ে দেবার পরই লোকটি ঝোপের একপাশে যে সাইকেলটা তার রাখা ছিল সেটার উপরে উঠে বসে যেদিকে গাড়িটা গিয়েছে সেই দিকে চালাল।

রঞ্জিৎ সিং বেশী সুব্রত আসরে গান শুনতে শুনতে এমনি তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে এক সময় করবী আসর থেকে উঠে গিয়েছে তা সে টেরই পায়নি। হঠাৎ খেয়াল হতেই চেয়ে দেখে করবী তার জায়গায় নেই। আশ্চর্য! কোথায় গেল করবী? আসর থেকে উঠে পড়লো সুব্রত এবং হলঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই বেবী নিঃশব্দে তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

সুব্রতবাবু।

কে? ও বেবী।

কতবার আপনাকে বাইরে আসবার জন্য চোখের ইশারা করেছি, কিন্তু আপনি বুঝতেই পারলেন না।

কি ব্যাপার?

আধঘণ্টাটাক আগে একটা চিঠি পেয়েছি।

চিঠি।

হ্যাঁ, এই যে দেখুন—

একটা পুরু চৌকো খাম এগিয়ে দিল বেবী সুব্রতর দিকে ব্লাউজের ভিতর থেকে বের করে।

হলঘরের দরজা থেকে একটু সরে গিয়ে সুব্রত খাম থেকে চিঠিটা বের করলো। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত চিঠি।

বেবী,

গাড়ি পাঠালাম, চিঠি পাওয়া মাত্রই চলে আসবে। ছোটকাকা।

হঠাৎ বোধহয় কাকা ফিরে এসেছেন এবং এসে বাড়ীতে আমাকে না দেখতে পেয়ে বোধহয় চিঠি দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আপনি বলেছিলেন আপনার অনুমতি না নিয়ে যেন এখান থেকে কোথাও না যাই, তাই—

বেশ করেছো। আজ রাত্রে কোথাও যাবে না। কাল সকালে আমি

নিজে তোমাকে বাড়ী পেঁছে দেবো। কিন্তু করবীদেবী কখন গানের আসর থেকে উঠে গেছেন খেয়াল করেছো ?

না তো।

যাও তুমি হলঘরে। আমি নিচটা একটু ঘুরে আসছি। মনে থাকে যেন একা এ বাড়ী থেকে আজ রাত্রে কোথাও যাবে না। এমন কি আমি বললেও না।

বেশ।

বেবী হলঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো আর সুব্রত প্রথমে উপরের তলায় ঘরগুলো খুঁজে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলো। অন্যমনস্ক ভাবে হাত ঘড়িটার দিকে একবার তাকালো। রাত বারটা বেজে চল্লিশ মিনিট। উপরের তলায় ওস্তাদজী বাগেশ্রীর আলাপ ধরেছেন। নিস্তব্ধ বাড়ীটার মধ্যে উদাত্ত মধুকণ্ঠের সে সুরালাপ যেন মধ্যরজনীর ধ্যানের তন্দ্রীতে কি এক অনৈস্বর্গিক ঝঙ্কার তুলছে। আশ্চর্য! এত রাত্রে কোথায় গেল করবী ?

হঠাৎ এলোমেলো চিন্তাস্রোতে যেন একটি লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হলো। মুহূর্তে জাগলো একটি আবর্ত! আজ সকালের সেই চিঠিটার কথাগুলো বিদ্যুৎ চমকের মতই যেন মনের পাতায় ভেসে উঠলো জ্বল জ্বল অক্ষরে সুব্রতর। অপূর্ব, প্রস্তুত থেকো। রাত বারটার পর। 'রুইতন'। এবং সঙ্গে সঙ্গে সোজা গিয়ে সকাল বেলার নিচের তলার সেই ঘরটির শিকল খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকলো সুব্রত।

অন্ধকার ঘর। মুহূর্তের জন্য অন্ধকারে দাঁড়িয়ে যেন কি ভাবলো। তারপরই পকেট থেকে টর্চটা বের করে টর্চের আলোয় সুইচটা দেখে নিয়ে আলোটা জেবলে দিল সুব্রত।

সকালের মতই ঘরটা খালি। ঘরটা খালি বটে তবু যেন সুব্রতর কেমন মনে হয় ঘরের মধ্যে কি যেন ছিল ক্ষণপূর্বেও অথচ এখন আর নেই। একটা মৃদু মিষ্টি গন্ধ আর সেই গন্ধের সঙ্গে যেন আরো একটা কিসের গন্ধ ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে আছে, মিষ্টি অথচ উগ্র! দুটি গন্ধের অপূর্ব একটি সংমিশ্রণ।

নাক দিয়ে গন্ধটা টেনে টেনে গ্রহণ করবার চেষ্টা করে সুব্রত। আর সতৃষ্ণ প্রত্যাশী দৃষ্টি তার সেই সঙ্গে যেন ঘরের চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে। হঠাৎ নজরে পড়ে, দেওয়ালে আলমারিটার সামনে কি একটা সাদা মত বস্তু পড়ে আছে। কৌতূহলে এগিয়ে যায় সুব্রত।

একটা রুমাল।

নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে রুমালটা তুলে নিতেই মিষ্টি একটা গন্ধ নাসারন্ধ্রে এসে মৃদু ঝাপটা দিল সুব্রতর।

এই তো সেই 'কালিফোর্নিয়ান পপি'র সুবাস। কালিফোর্নিয়ান পপি করবীর প্রিয় সেন্ট। মনে পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। সুব্রত এবারে রুমালটা

ভালো করে চোখের সামনে আলোতে মেলে ধরলো। ছোট লেডিজ রুমাল। এবং রুমালের এক কোণে লাল সিল্কের সুতোয় লেখা 'রুবি'।

নিঃসন্দেহ হয় এবার সুব্রত, করবীরই রুমাল। কিন্তু রুমালটা এ ঘরে এখানে পড়ে কেন আলমারিটার সামনে। তবে কি করবী আজ রাত্রে এ ঘরে এসেছিল। কিন্তু ঘরের দরজার শিকল বাইরে থেকে তোলা ছিল। তবে— আলমারিটার দিকে তাকালো সুব্রত। দেওয়ালে গাঁথা কাঠের আলমারি। আলমারির কবাটের গায়ে সাদা হাতীর দাঁতের দামী 'নব' বসানো।

করবীদেবী এঘরে নিশ্চয়ই এসেছিল। রুমালটা তার প্রমাণ।

কিন্তু রুমালটা এখানে পড়ে কেন? রুমাল ফেলে যাবার মত অন্যমনস্ক প্রকৃতির মেয়ে তো নয় করবী। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কের মত সুব্রত আলমারির গায়ে সাদা হাতীর দাঁতের নবটায় হাত দিয়ে মোচড় দিতেই যন্ত্রণায় একটা উঃ শব্দ করে ওঠে নিজের অজ্ঞাতেই যেন। কি যেন ছুঁচের মত হাতের পাতায় ফুটলো।

কি ফুটলো। হাতের পাতাটা সুব্রত চোখের সামনে মেলে ধরে দেখবার চেষ্টা করে আলোয়। এখনো চিন্ চিন্ করে জ্বালা করছে। আবার সুব্রত আলমারির গায়ে 'নব'টার দিকে তাকালো। কিন্তু এ কি। হাতটা যেন কেমন অসাড় হয়ে আসছে ক্রমশঃ। হাতের ক্রিয়াশীল পেশীগুলো যেন কেমন শিথিল—অনড় হয়ে আসছে। হাতটা সুব্রত তোলবার চেষ্টা করে কিন্তু তুলতে পারে না। শক্তি নেই হাতটা তুলবার মত, সামান্য শক্তিও যেন তার হাতের পেশীগুলোতে আর নেই। শুধু হাত কেন, পাও যেন ক্রমশঃ তার অবশ হয়ে আসছে। দাঁড়াতেও কষ্ট হচ্ছে।

নমস্কার সুব্রতবাবু!

সহসা একটি ভারী পুরুষের কণ্ঠস্বরে সুব্রত তার শিথিল অবসন্ন দৃষ্টি তুলে যেন সামনের দিকে তাকালো।

॥ তেইশ ॥

আগন্তুক ধীরে ধীরে ঘরের একটিমাত্র দ্বারপথ ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল।

করবীদেবীর সন্ধান করছেন বোধহয়। আগন্তুক প্রশ্ন করে।

বোবা অসহায় দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে সুব্রত আগন্তুকের মুখের দিকে।

চলুন আমার প্রতি হুকুম আছে আপনাকে সেখানেই নিয়ে যেতে—সেখানে একটু আগে করবীদেবীকে পেঁছে দেওয়া হয়েছে।

সুব্রত জবাব দেয় না, কেবল ধীরে ধীরে মেঝের 'পরে বসে পড়ে। সব

দেখতে পাচ্ছে, সব বুঝতে পারছে অথচ ভাষায় সেটা প্রকাশ করতে পারছে না বাক্‌শক্তি সে হারিয়েছে। হাত আছে, পা আছে, কিন্তু সেগুলো অচল পাথর !

এগিয়ে এলো আগন্তুক এবার সুব্রতর সামনে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, পরিধানে লংস ও হাফ্ সার্ট। চওড়া উঁচু কপাল, ছোট ছোট গর্তে বসা চোখ। বাটারফ্লাই গোঁফ ও নূর দাড়ি। লোকটি এগিয়ে এসে মৃদু হেসে সুব্রতর নিশ্চল অথর্ব দেহটা কাঁধের উপর তুলে নিল, তারপর ঘরের সেই আলমারির দরজাটা খুলে ঘরের বাইরে এসে পা দিল।

ধীরে ধীরে চোখ মেলছে করবী। দু'চোখের পাতায় যেন এখনো ঘুমের অবসন্নতা। ভারী। ঘরের মধ্যে একটা নীলাভ আলোর জ্যোতি যেন কুয়াশার মত ছড়িয়ে আছে। একটা আরাম কেদারার উপর আধ শোওয়া ও বসা অবস্থায় রয়েছে করবী।

ঘরটার মধ্যে আসবাবপত্র একপ্রকার নেই বললেই হয়। যে আরাম কেদারাটার উপরে করবী রয়েছে সেটা ছাড়া দেখা যাচ্ছে আর গোটা দুই চেয়ার ও একটা ছোট টেবিল। মাথার উপরে একটি সিলিং ফ্যান বন বন শব্দে ঘুরে চলেছে। দুটি মাত্র জানালা ঘরের তাও বন্ধ। এবং একটি মাত্র দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। ঘরের সিলিংয়ের ঠিক মধ্যস্থলে চৌকো বাক্সের মত একটা জায়গা—স্কাই লাইট। চার দিকে তার কাঠের ফ্রেমে কাচ বসানো পাল্লা। সেগুলো হিঞ্জের 'পরে এদিক ওদিক ঘোরে। ঘরের টেবিলটার সামনে দণ্ডায়মান দেখা যাচ্ছে সন্তোষ মিত্রকে।

ক্রমে করবী চোখ মেলে তাকালো। দৃষ্টিতে বিস্ময় তার। এদিক ওদিক অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালো।

ঘুম ভাঙ্গলো রুবি ?

সেই কণ্ঠস্বরে চম্‌কে মুখ তুলে ঐ দিকে তাকালো করবী। চোখাচোখি হলো এক জোড়া ক্ষুধিত দৃষ্টির সঙ্গে।

আবার প্রশ্ন হলো, ঘুম ভাঙ্গলো ?

সন্তোষবাবু !—বিস্মিত করবী নামটা উচ্চারণ করে।

চিনতে পেরেছো দেবী, ধন্যবাদ।

চেয়ে আছে নির্বাক করবী সন্তোষ মিত্রের দিকে। সমস্ত ঘটনাটা সে যেন মনে মনে বুঝবার চেষ্টা করে। অস্পষ্ট ধোঁয়ার মত চিন্তাটা ক্রমষঃ একটা নির্দিষ্ট আকার নিচ্ছে। ছিল বাগানবাড়ীতে দক্ষিণেশ্বরে। গানের আসরে বসে গান শুনছিল। তার বাবা রমেন্দ্রবাবু তাকে ডাকছেন বলে একজন ভৃত্য এসে তাকে সংবাদ দেয়। তাড়াতাড়ি সে গানের আসর থেকে উঠে আসে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে চলে আসে। তারপর সেই ঘর।—সব মনে পড়ছে করবীর।

সে আবার তাকালো তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে অদূরে দণ্ডায়মান সন্তোষ মিত্রের দিকে।

বাধ্য হয়েই একান্ত অনিচ্ছায় যে জবরদস্তিটুকু করতে হয়েছে তার জন্য অনুতপ্ত আমি। ক্ষমা চাইছি। ইঙ্গিত আমার বুঝতে পারলে আর এ কষ্টটুকু তোমাকে পেতে হতো না রুবী।

এ সবের মানে কি সন্তোষবাবু?

মানেটা কি এখনো তোমার কাছে অস্পষ্ট রয়েছে করবী?

নিশ্চয়ই। এভাবে বাগান বাড়ী থেকে আমাকে ধরে নিয়ে আসলেন কেন চাতুরী করে।

এই সামান্য চাতুরীটুকু না করলে কি তুমি ধরা দিতে করবী। চাতুরী আমি সহজে কারো সঙ্গে করি না, যদি না সে চাতুরী খেলায়।

ভাল চান তো আমাকে ছেড়ে দিন—

পাগলী। ছেড়ে দেবো বলে বুঝি এত কষ্ট করে ধরে নিয়ে এলাম।

করবী উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। একটা সিল্ক কর্ড দিয়ে তার কোমরের সঙ্গে বসবার চেয়ারটায় বাঁধা—উঠতে গিয়েই সেটা সে টের পায়।

করবীর উঠবার চেষ্টা দেখে হেসে ফেলে সন্তোষ মিত্র। এবং বলে ব্যস্ত কি, বোস না—আঘাটায় আর কিছু এসেতো পড়োনি তো।

দরজায় ঐ সময় মৃদু নক্ পড়লো। তিনটি পর পর।

কি?

আবার পূর্বের মত তিনবার নক্ পড়লো।

এগিয়ে গিয়ে সন্তোষ মিত্র ঘরের দরজাটা এবারে খুলে দিতেই হাত পা বাঁধা অবস্থায় সুব্রতকে কাঁধে নিয়ে পূর্বের সেই লোকটি এসে ঘরে প্রবেশ করলো।

এনেছি। লোকটি বলে।

ঐ চেয়ারটার উপরে বসিয়ে দে—

সুব্রতকে লোকটা চেয়ারের উপর বসিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যাবার জন্য দরজার দিকে এগুতেই সন্তোষ বললে, বাইরে অপেক্ষা কর ভজা, কাজ আছে।

এবারে এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা আবার পূর্ববৎ ভিতর থেকে বন্ধ করে উপবিষ্ট সুব্রতর মুখোমুখি ফিরে দাঁড়ালো সন্তোষ মিত্র।

তারপর মিঃ সিং, ওরফে টিকটিকি সুব্রতবাবু—

সুব্রত কোন জবাব দেয় না, শুধু চেয়ে থাকে সন্তোষ মিত্রের মুখের দিকে।

সন্তোষ মিত্র আবার বলে, কিছুদিন থেকেই তোমার ধৃষ্টতা লক্ষ্য করছিলাম। কিন্তু কিছু জানতে দিইনি তোমাকে। দেখছিলাম কেবল তোমার দৌড়টা কতদূর?

সুব্রত নির্বাক।

কি রায় মশাই, একেবারে যে বোবা বনে গেলেন। বোবা অবিশ্যি

আপনাকে আমি একটু পরেই চিরদিনের মত করে দেবো। একেবারে জ্যান্ত মাটির নিচে নির্বিঘ্নে ঘুমোতে পারবেন বাকী জীবনটার মতো বোবা হয়েই।

আত্মপ্রসাদের গর্বে দিশেহারা সন্তোষ মিত্র লক্ষ্য করেনি যে, ঠিক ঐ সময় মাথার উপরে স্কাইলাইটের পাল্লাটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে এবং একটা কুৎসিত মুখ সেই পাল্লা পথে ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে।

সুব্রতবাবু!—আর্তকণ্ঠে ডেকে ওঠে করবী।

সুব্রত তাকালো করবীর মুখের দিকে। বললে, ভয় নেই করবীদেবী। ওকে আস্ফোলন করতে দিন। ওর বাগানবাড়ীর চারপাশে পুলিশ প্রহরীরা ওৎ পেতে আছে।

বটে। এখনো তাহলে আশা, তারা এসে সীতাদেবীর উদ্ধার সাধন করবে। ভাল, ভাল—

হঠাৎ ঐ সময় ঘরের মধ্যে একটা ঝপ করে শব্দ হতেই যুগপৎ সকলেই চমকে তাকালো। দীর্ঘকায় কুৎসিত এক ব্যক্তি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে লোকটা ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছে।

কথা বলে প্রথমে সন্তোষ মিত্রই, বংশী।

হ্যাঁ, বংশীই!—লোকটি জবাব দেয় তারপর এগিয়ে যায় করবীর দিকে।

চেঁচিয়ে ওঠে সন্তোষ মিত্র, বংশী!

বারেকের জন্য ফিরে তাকালো বংশী সন্তোষ মিত্রের দিকে, তারপরই আবার করবীর দিকে এগিয়ে যায়।

সুব্রত আর করবী নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ক্ষণপূর্বে স্কাই-লাইটের ফাঁক দিয়ে যে কুৎসিত লোকটা ঘরের মধ্যে এসে লাফিয়ে পড়েছে তারই মুখের দিকে। আগন্তুক বংশী যেমন দীর্ঘ তেমনি বলিষ্ঠ। তার পরিধানে ছিল কালো রংয়ের একটা লংস্ ও গায়ে একটা অনুরূপ হাত কাটা গেঞ্জী। আচমকা লোকটাকে দেখলে সত্যিই শিউরে উঠতে হয়। মাথার চুল ছোট ছোট করে কদম ছাঁট দেওয়া। ছোট কপাল, নাকের নীচটা বসা। ছোট ছোট চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, এককালে মুখখানা যে রকমই থাকুক না কেন, এখন তার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই আগুনে পুড়ে গিয়ে। চামড়া পুড়ে কুচকে গিয়ে একটা চোখ ট্যারা হয়ে গিয়েছে। এবং সেই কারণেই উপরের ওষ্ঠে টান ধরায় উপরের পাটি দাঁত মাড়ি সমেত প্রকট হয়ে উঠেছে। ফলে সমস্ত মুখখানাই ভয়াবহ একটা কুৎসিত আকার নিয়েছে। গায়ের রং কালো!

বংশীকে করবীর দিকে এগিয়ে যেতে দেখে তীক্ষ্ন আক্রোশভরা কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে সন্তোষ মিত্র, খবরদার বংশী, খুন করে ফেলবো—

বংশীর তখন ভ্রূক্ষেপও নেই যেন। সে এগিয়ে গিয়ে করবীর বন্ধনটা খুলে দেবার জন্য হাত বাড়ায়।

এবং সেই মুহূর্তে সন্তোষ মিত্র ত্বরিতপদে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে

দিতেই, যে লোকটা অল্পক্ষণ আগে সুব্রতকে নিয়ে এসেছিল সে এসে ঘরে ঢুকলো। কিন্তু ততক্ষণে বংশী ধারালো একটা ছুরির সাহায্যে করবীর বন্ধন কেটে তাকে মুক্ত করে দিয়েছে ক্ষিপ্র হস্তে বলতে গেলে চক্ষের পলকে।

করবী উঠে দাঁড়ায়।

যান, শিগ্‌গির পালান। বাইরে নির্মল গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। বংশী দ্রুতকণ্ঠে করবীকে বলে।

ওদিকে লোকটা তখন বংশীর উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বংশী তার আক্রমণকারীকে তলপেটে একটা ঘুসি বসিয়ে ছিট্‌কে ফেলে দিল দূরে।

সন্তোষ মিত্রও এবারে এগিয়ে আসে বংশীকে আক্রমণ করবার জন্য।

॥ চব্বিশ ॥

সন্তোষ মিত্রের সঙ্গে বংশী যখন যুঝছে এবং দ্বিতীয় ধরাশায়ী লোকটা ওদিকে উঠে বসবার চেষ্টা করছে, তখন করবী বংশীর ভূপতিত ছোরাটা তুলে নিয়ে চটপট সুব্রতর হাতের ও পায়ের বাঁধনগুলো কেটে দেয়। দ্বিতীয় লোকটি ততক্ষণে এগিয়ে এসে সন্তোষ মিত্রের সঙ্গে যোগ দিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে বংশীকে আক্রমণ করেছে।

আক্রমণকারীদের বাধা দিতে দিতে বংশী চেঁচিয়ে বলে, কি করছেন সুব্রতবাবু, করবীদেবীকে নিয়ে পালান। আর পুলিশে একটা ফোন করে দিন, পাশের ঘরে ফোন আছে।

কে? কে আপনি? —সহসা করবী এতক্ষণে যেন কণ্ঠস্বরটা চিনতে পেরে বংশীর দিকে চেয়ে চিৎকার করে ওঠে।

করবী হতভম্ব।

আঃ, কি করছেন করবীদেবী, যান, যান—বংশী আবার চেঁচিয়ে বলে।

সুব্রতর শরীরের শৈথিল্য ও অবসাদ তখনো পুরোপুরি কাটেনি। তথাপি কোনমতে করবীর সাহায্যে সুব্রত ঘর থেকে বের হয়ে যায়। সন্তোষ মিত্রের অনুচর তখন বংশীকে প্রায় মাটিতে শুইয়ে ফেলে কায়দা করে এনেছে।

করবীর সাহায্যেই সুব্রত ঘর থেকে বের হয়ে প্রথমেই দরজার শিকলটা করবীকে তুলে দিতে বললো।

করবী দরজার শিকল তুলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

তার সর্বাঙ্গ তখনো কাঁপছে ভয়ে উত্তেজনায়।

চলুন পাশের ঘরে করবীদেবী। বংশী বললো ঐ ঘরে নাকি ফোন আছে। সুব্রত বলে।

দুজনে এসে পাশের ঘরে ঢুকলো। সুব্রতই পুলিশ হেড কোয়ার্টারে

ফোন করে দিল।

আরো আধ ঘণ্টা পরে যখন মতিঝিলে পুলিশের ভ্যান এসে দাঁড়ালো সুব্রত তখন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। তার দেহের স্বাভাবিক শক্তি আবার ফিরে এসেছে। বংশী বলা সত্ত্বেও সুব্রত করবীকে যেতে দেয়নি। তাকে ঘরের মধ্যেই বসিয়ে রেখেছে।

বারান্দায় লাইট জ্বালিয়ে ওরা অপেক্ষা করছিল। গেট দিয়ে ঢুকে পুলিশের কালো রংয়ের ভ্যান দুটো তীব্র স্পট্ লাইট জেলে বারান্দার সামনে এসে পর পর দাঁড়ালো। প্রথমেই ভ্যান থেকে নামলেন পুলিশ ইনসপেক্টর রথীন রুদ্র।

এই যে সুব্রতবাবু।

আমি নিজে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, নইলে কাল্‌প্রিটকে আমিই ধরতে পারতাম। তাহলেও ঘরের মধ্যে আটকেছি। সুব্রত বলে।

কোন্ ঘরে ?

চার পাঁচজন আর্মড পুলিশকে ডাকুন, একত্রে সব ঘরের মধ্যে ঢুকতে হবে। সুব্রত ইনস্‌পেক্টরকে সতর্ক করে দেয়।

রথীন রুদ্রের নির্দেশে তখুনি চারজন গুর্খা আর্মড পুলিশ ভ্যান থেকে নেমে এলো। সকলে মিলে তারপর শিকল তোলা পাশের দরজাটার সামনে এসে দাঁড়াল। সুব্রত বন্ধ দরজার গায়ে কান পেতে প্রথমে শুনবার চেষ্টা করলো কোন শব্দ টব্দ কিছু পাওয়া যায় কিনা। প্রথমে কিছুই শুনতে পায় না। তারপর একটা ক্ষীণ গোঙ্গানীর শব্দ যেন মনে হলো ঘরের ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে সুব্রত শিকলটা খুলেই দড়াম করে কপাট দুটো একেবারে ঠেলে দিল। কিন্তু ঘরের মধ্যে পা দিয়েই সুব্রত থমকে দাঁড়াল অর্ধস্ফুট একটা শব্দ করে। ঘরের মধ্যে বংশী ছাড়া দ্বিতীয় কোন প্রাণীই নেই। এবং বংশী রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝের উপরে পড়ে ছটফট করছে আর গোঙ্গাচ্ছে যন্ত্রণায়। সুব্রত তাড়াতাড়ি এসে বংশীর সামনে দাঁড়ালো।

বংশী।

করবীও পুলিশের পিছনে পিছনে সকলের অজ্ঞাতে পাশের ঘরে এসে প্রবেশ করে।

অনিমেষের চেহারার সঙ্গে তার পরিচয় নেই বলেই বংশীকে সে চিনতে পারেনি। কিন্তু প্রথমটায় তার গলার স্বরে তাকে চিনতে না পারলেও শেষের দিকে চিনেছিল।

বংশী আর কেউ নয় অনিমেষবাবুই।

কিন্তু বিস্ময় তখনো তার কাটেনি।

বংশীই অনিমেষ, ব্যাপারটা যেন তখনো তার কাছে কি রকম গোলমেলে মনে হয়।

আমাকে ছোরা মেরে ওরা ঘরের বাথরুমের দরজা দিয়ে পালিয়েছে। কথাগুলো কোনমতে টেনে টেনে বলে বংশী হাঁপাতে থাকে।

নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকে করবী রক্তাক্ত বংশীর দিকে।

কোথায়? কোথায় গিয়েছে সে? সুব্রত আবার প্রশ্ন করে।

জানিনা—সুব্রতবাবু।

করবী যে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে বংশী কিন্তু টের পায় না। কারণ করবী সুব্রতর পশ্চাতে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল তখন।

সুব্রত আবার বলে, যে বাড়ীতে করবীদেবী থাকেন বরাহনগরে আমিও সেই বাড়ীতেই থাকতাম। আমার ঘরে লিখবার টেবিলের ড্রয়ারে একটা চিঠি আছে করবীদেবীর নামে, তাকে সে চিঠিটা দেবেন দয়া করে—

তাহলে করবী আপনাকে চিনতো?

হ্যাঁ। না—চাক্ষুস তিনি আমাকে কখনো দেখেননি—একটু জল—সুব্রত একজন পুলিশকে বললো পাশের ঘর থেকে জল নিয়ে আসতে। করবী-দেবীকে ডাকবো? সুব্রত বলে।

না, না—আর্তকণ্ঠে মিনতি জানায় বংশী।

একটা কথা বংশী, নির্মল চৌধুরী কি আজও বেঁচে আছে।

হ্যাঁ।—

গ্লাসে করে জল নিয়ে পুলিশটা এসে ঘরে ঢুকলো। কিন্তু বংশীর মুখে জল দেওয়া সত্ত্বেও সে জল গিলতে পারলো না। কষ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

করবী ঐ সময় বংশীর সামনে এগিয়ে এসে ডাকলো, অনিমেষবাবু।

কে।

আমি রুবি, চিনতে পারছেন না আমাকে—

না, না—আপনি কেন এখানে এলেন, যান, যান—নির্মল, নির্মল আপনার জন্য—

কিন্তু কথাটা শেষ করতে পারলো না অনিমেষ। একটা হেঁচকি তুলে কণ্ঠ তার চিরদিনের মতই থেমে গেল।

শেষবারের মত বংশীর আগুনে পোড়া, কুৎসিত মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত হলো। তারপরই টেনে একটা শ্বাস নিয়ে বংশীর প্রাণটা বের হয়ে গেল।

অনিমেষ! অনিমেষ—চিৎকার করে ওঠে সুব্রত।

অনিমেষবাবু—করবী চেঁচিয়ে ডাকে।

কিন্তু সবই তো তখন শেষ হয়ে গিয়েছে।

মুহূর্তকাল বংশীর মৃত্যুশান্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে অবসন্ন কণ্ঠে সুব্রত বললে, এখনো জানিনা মিঃ রুদ্র আসলে লোকটা কে, কি ওর সত্য পরিচয়।

বাট্ আই মাস্ট সে, আজ ও না থাকলে আমার ও করবীদেবীর মৃতদেহ হয়ত ওরই মতো এইভাবে এই ঘরের মধ্যে পড়ে থাকতো এতক্ষণ। তারপরই একটু থেমে আবার সুব্রত যেন আপন মনেই বলে, আশ্চর্য্য ভালবাসা!

ভালবাসা কার?

ঐ বংশীর—অনিমেষের। কিন্তু সে কথা পরে শুনবেন, আগে সেই শয়তানটার খোঁজ করতে হবে।

বলতে বলতে সুব্রত বাথরুমের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু দেখা গেল বাথরুমের দরজা বাইরের দিক থেকে বন্ধ।

যা ভেবেছিলাম তাই। ওদিক থেকে দরজা বন্ধ করে পালিয়েছে। সুব্রত রুদ্রকে বললে।

বাড়ীর পিছন দিক দিয়ে ঘুরে সকলে গিয়ে দেখলো, বাথরুমের অন্য দরজাটি তখনো খোলাই রয়েছে। বুঝতে কষ্ট হলো না পাখী উড়ে গিয়েছে।

গ্যারেজে সন্তোষ মিত্রের গাড়িটাও দেখা গেল না।

সুব্রত মৃদু হেসে বললে, চলুন এবারে মহাপ্রভুর আসল আস্তানায় যাওয়া যাক্ মিঃ রুদ্র।

আসল আস্তানা?—বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল রথীন রুদ্র সুব্রতর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, সন্তোষ মিত্র পরিচয়টা তো ছিল তার ছদ্মবেশ মাত্র। সে অবিশ্যি এখনো জানেনা যে, তার আসল ও সত্যিকারের পরিচয়টা আর আমার কাছে গোপন নেই। ভেবেছিলাম রেড হ্যাণ্ড ধরবো কিন্তু তা আর হলো না।

কতদূর যেতে হবে?

মতিঝিলে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করে পুলিশ ভ্যানে করেই সকলে যখন রওনা হলো রাত তখন প্রায় শেষ হতে চলেছে। করবীকেও সুব্রত সঙ্গেই নিল।

বললে, সকালেই আপনাকে আপনার বাড়ি পৌঁছে দেবো করবীদেবী। বাকী রাতটুকু আমাদের সঙ্গেই থাকুন।

চলন্ত ভ্যানের মধ্যে রথীন রুদ্রের পাশাপাশি বসে সুব্রত বললে, মিঃ রুদ্র, এই যে ছদ্মনামধারী সন্তোষ মিত্র, ইনিই হচ্ছেন আমাদের নরেন্দ্রনাথ ঘোষের হত্যাকারী। এবং শুধু নরেন্দ্রনাথের হত্যাকারীই নয়, ইনিই নরেন্দ্রনাথের অফিস ম্যানেজার শ্রীনাথ করকেও হত্যা করেছেন।

তবে নির্মল চৌধুরী—

না, বেচারীকে কৌশলে দুটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেই আসল হত্যাকারী জড়িয়েছিল মাত্র।

কিন্তু কেন?

প্রথমটায় অবিশ্যি মোটিভটা আমার কাছেও স্পষ্ট হয়নি, পরে বুঝতে পেরেছি। যেহেতু হতভাগ্য নির্মল চৌধুরী এই করবীদেবীকে ভালবাসতেন।

সে কি!

এখনো বুঝতে পারেননি?

কতকটা বুঝেছি।

করবী তখন অন্ধকারে ভ্যানের মধ্যে একপাশে চুপটি করে মাথা নিচু করে বসে।

একবার তার দিকে চেয়ে মৃদু কণ্ঠে সুব্রত বলতে লাগলো।

হ্যাঁ, বেচারী নির্মল চৌধুরীর ভালবাসাটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল হত্যাকারীর চোখে অমার্জনীয় অপরাধ। যে কারণে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রের মধ্যে কৌশলে জড়িয়ে নির্ভুলভাবে হত্যাকারী ফাঁসী কাঠের দিকে তাকে ঠেলে দিয়েছিল। চতুর চূড়ামণি সন্দেহ নেই লোকটি। কারণ সে এক তীরেই দুটি লক্ষ্যভেদ করতে চেয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, অনেক ভেবে চিন্তে কৌশলে নিরাপদ দূরত্বে বসে নির্বিঘ্নে তীর ছুঁড়লেও তিনটি মারাত্মক ভুল সে করেছিল।

কি রকম?

প্রথম ভুল তার, যে অব্যর্থ চিঠির টোপ ফেলে ফটোগ্রাফীর নেশাগ্রস্থ নরেন্দ্রনাথকে নিভুর্লভাবে, বিষ মাখানো ফিল্ম স্পুলটি ব্যবহারে প্রলোভিত করেছিল; সেই চিঠিটি নিজের উপরে অসাধারণ বিশ্বাস বশে নিজেরই টাইপ রাইটিং মেসিনে টাইপ করে।

কি রকম? রথীন রুদ্র প্রশ্ন করেন।

সেই মেশিনের টাইপগুলোর মধ্যে দুটি অক্ষর ড্যামেজড্ ছিল, বড় হাতের 'ইউ' ও 'এন্'। এবং যেটা সেই টাইপ করা চিঠির মধ্যে হত্যাপ্রচেষ্টার অব্যর্থ প্রমাণ হিসাবে আদালতে উপস্থাপিত হবে। এবং দ্বিতীয় ভুল তার হয়েছিল সেই চিঠিটার ইউ, কে, র একটি ব্যবহৃত ষ্টাম্প ব্যবহার করলেও চিঠিটা ডাকে না পাঠিয়ে হাতে পাঠিয়ে, যেটা আমাদের চোখে সহজেই ধরা পড়েছে, ভারতবর্ষের কোন পোষ্ট অফিসের চিঠিটার উপরে ছাপ না থাকায়।

তারপর?

তারপর তৃতীয় ও শেষ পয়েন্ট হচ্ছে শ্রীনাথ করকে হত্যার পর রিভলবারটা অকুস্থানে ফেলে রেখে গেলেও সে জানতো না যে, নির্মল চৌধুরী যদি ঐ রিভলবার দিয়ে হত্যা করে থাকেই, তাতে কেবল যে রিভলবারের ট্রিগারেই তার আঙ্গুলের ছাপই থাকবে তাই নয়, তার হাতে নাইট্রাইটের ডিপোজিটও থাকবে গুলি ছুড়ে থাকলে এবং যেটা তার হাতের প্যারাফিন কাষ্ট নিলেই ধরা পড়বে।

পাওয়া গিয়েছিল সে রকম কিছু নির্মল চৌধুরীর হাতে?—রথীন রুদ্র আবার প্রশ্ন করেন।

না!—সুব্রত ধীর কণ্ঠে জবাব দেয়।

করবী একবার ঐ সময় চমকে অন্ধকারেই সুব্রতর দিকে তাকাল।

জগুবাবুর বাজার ছাড়িয়ে তখন গাড়ি ছুটেছে ভবানীপুরের দিকে। আকাশে ভোরের আলো আরো স্পষ্ট মনে হয়।

রথীন রুদ্রকে ড্রাইভার প্রশ্ন করে, কোন্ দিকে যাবো ?

সুব্রত ঠিকানা বলে দেয়।

বিনয়েন্দ্রর বালীগঞ্জের বাড়ীর সামনে এসে পুলিশ ভ্যান দুটো দাঁড়ালো। সুব্রতই এগিয়ে গিয়ে কলিং বেল টিপলো।

একটু পরেই চোখ মুছতে মুছতে ভৃত্য বের হয়ে এলো।

কাকে চান ?

বাবুকে একবার খবর দাও। বলো, সুব্রতবাবু দেখা করতে চান, জরুরী দরকার।

বাবু তো নেই।

নেই মানে ?

না, আজ পাঁচ ছ'দিন হলো ধানবাদ গেছেন, এখনো ফেরেননি।

এখনো ফেরেননি ?

না।

সুব্রত যেন কি ভাবে ক্ষণকাল। তারপরই বলে, ঠিক আছে তুমি একবার উপরে গিয়ে বাবুর ঘরটা দেখে এসো তিনি ফিরেছেন কিনা।

সহসা এমন সময় দ্বারপথে নারী কণ্ঠ শোনা গেল, কে রে-পরেশ ?

সেই নারীকণ্ঠ শোনামাত্রই সুব্রত চমুকে উঠেছিল।

পরিচিত নারী কণ্ঠ।

সুব্রত সামনের দিকে তাকালো। তার ভুল হয়নি। বিমলাদেবীই।

নমস্কার বিমলাদেবী। আমাকে চিনতে পারছেন নিশ্চয়ই ?

আপনি ?—

সুব্রত রায়। ঘোষ নিবাসে নরেন্দ্রনাথের হত্যার পর আপনার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল আমার। মনে পড়ছে নিশ্চয়ই—

হ্যাঁ।....

বিনয়েন্দ্রবাবুর সঙ্গে একটিবার দেখা করতে চাই যে—

কিন্তু বিনুদা তো বাড়ীতে নেই। তিনি ধানবাদে—

না, আপনি মিথ্যে বলছেন বিমলাদেবী।

বলতে বলতে রথীন রুদ্রকে চোখের ইঙ্গিত করে তাকে অনুসরণ করতে বলে ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সুব্রত আবার বলে, চলুন ঘরের ভিতরে বিমলাদেবী।

সকলে এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

বিমলা যেন কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছে।

বিনয়েন্দ্রবাবুকে একটিবার ডাকুন। সুব্রত আবার বলে।

বললাম তো তিনি বাড়ীতে নেই।

কিন্তু আমি জানি তিনি আছেন। আপনি ভুলে যাচ্ছেন শাক দিয়ে চিরদিন মাছ ঢাকা চলে না বিমলাদেবী।

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে বিমলা সুব্রতর মুখের দিকে।

সুব্রত আবার বলে, হ্যাঁ, আপনাদের মনোরম পাখীর বাসা এবারে সত্যি সত্যি হাওয়ায় নড়ে উঠেছে।

বিমলা পূর্ববৎ চেয়েই থাকে সুব্রতর মুখের দিকে।

চেয়ে আছেন কি আমার মুখের দিকে। এখনো চুপ করে কেন দাঁড়িয়ে আছেন—

এসব কদর্য ইঙ্গিতের মানে কি সুব্রতবাবু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

কিন্তু আমি যদি বলি বিমলাদেবী, আমার কদর্য ইঙ্গিতের চাইতেও ঢের বেশী কদর্য জঘন্য ব্যবহার বিনয়েন্দ্রবাবু করেছেন আপনার সঙ্গে—।

কি বললেন!

হ্যাঁ, এদিকে আপনার সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলে অন্যত্র নিত্য নতুন নারী সম্ভোগের লীলাখেলায় তিনি—

সুব্রতর শেষের কথাগুলো যেন সহসা মন্ত্রপূত বারি ছিটিয়ে দিল বিমলাদেবীর সর্বাঙ্গে। সে যে চিরন্তন নারী। ভালবাসার ব্যাপারে কোনদিনই যে কোন নারী অন্য নারীর প্রতি তার প্রেমিকের এতটুকু আকর্ষণও, বিশেষ করে পরকীয়া ও গোপন প্রেমের ব্যাপার একেবারে সহ্য করতে পারে না, সেটাই যেন আবার প্রমাণিত হয়ে গেল নতুন করে।

সব কিছু ভুলে বিমলাদেবী চিৎকার করে উঠলো তীক্ষ্ন কণ্ঠে, না, অসম্ভব কখনোই না।

সুব্রত উল্লসিত হয়ে ওঠে। তার নিক্ষিপ্ত তীর ঠিক লক্ষ্যভেদ করেছে। সুব্রত শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বলে, কেন না। কেনই বা অসম্ভব। হতভাগ্য নরেন্দ্রনাথকে যখন আপনি প্রেমের স্বপ্নে মশগুল করে গোপনে তাঁর ছোট ভাই বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলছিলেন তখন কেন ভাবতে পারেননি যে, পুরুষ অন্যের ভালবাসার পাত্রীকে জেনে শুনে ছিনিয়ে নিতে পারে বিশ্বাসের মূল্য তার কাছে এক কপর্দকও নেই—

না, না—বিশ্বাস করি না, আপনার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। বিনয়—

বিশ্বাস করেন না, না। যান তো মিঃ রুদ্র, করবীদেবীকে এ ঘরে ডেকে নিয়ে আসুন একবার।

রথীন রুদ্র ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

একটু পরে করবী প্রবেশ করতেই সুব্রত তাকে দেখিয়ে বিমলাকে বলে, এই যে জিজ্ঞাসা করুন এই করবীদেবীকে। আজ রাত্রে ইনিই আপনার

অসীম প্রেমাস্পদের আর একজন ভিক্‌টিম্‌ হতে চলেছিলেন। এবং হতেনও এতক্ষণে যদি না ভাগ্যক্রমে তার থাবা থেকে ওকে আজ উদ্ধার করতে সক্ষম হতো আর এক হতভাগ্য।

না, না—

॥ পঁচিশ ॥

আমি জানি বিমলাদেবী, আপনি বিনয়েন্দ্রের আসল চরিত্রটা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। মানুষের দেহে লুকিয়ে ছিল জঘন্য এক নারীদেহ লোলুপ পিশাচ বললেও অত্যুক্তি হয় না তাকে। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কোন্‌ পিশাচকে ভালবেসে আপনি আপনার সর্বস্ব দিয়েছিলেন নিশ্চিত বিশ্বাসে।

বিমলা একটা সোফার 'পরে তখন বসে পড়েছে।

তার চোখে মুখে সর্বস্ব হারাবার মর্মান্তিক বেদনা যেন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ক্ষত বিক্ষত বিমলার হৃদয়ে তখনো সুব্রত নিষ্ঠুরতার চাবুক হেনে চলেছে। সে বলে চলে, আজ বুঝতে পারছেন আপনার অকৃত্রিম ভালবাসার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কি নিষ্ঠুর হৃদয়হীনের মত আপনার প্রতি সে ব্যবহার করেছে। আপনার সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করে দিনের পর দিন আপনার অসাক্ষাতে কিভাবে অন্য নারীকে নিয়ে স্ফূর্তি করেছে-

ঠিক ঐ সময় পরিচিত এক কণ্ঠস্বরে ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই যুগপৎ অন্দরে প্রবেশের দ্বারপথের দিকে সচকিতে দৃষ্টিপাত করে।

দ্বারপথে এসে দাঁড়িয়েছেন বিনয়েন্দ্রনাথ। তার পরিধানে পায়জামা ও স্লিপিং গাউন। মাথার চুল রুক্ষ। দেখলেই মনে হবে সদ্য বুঝি ঘুম ভোঙ্গ শয্যা থেকে উঠে এলেন। কিন্তু কেউ কোন সাড়া দেয় না। ঘরের মধ্যে যেন একটা অখণ্ড স্তব্ধতা থম থম করছে।

একি সুব্রতবাবু, কি ব্যাপার? এ অসময়ে! বিনয়েন্দ্র এবারে সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়েই কথা বলে। অদ্ভুত শান্ত ও ধীর তার কণ্ঠস্বর।

সহসা ঐ সময় করবী তীক্ষ্ন কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, চিনেছি, চিনেছি সুব্রতবাবু, সন্তোষ, সন্তোষ মিত্র—এই, এই সেই স্কাউণ্ড্রেল।

ব্যাপার কি সুব্রতবাবু? হু ইজ দিস্‌ গার্ল?—পূর্ববৎ শান্ত কণ্ঠে কথা বলেন আবার বিনয়েন্দ্র।

শয়তান, স্কাউণ্ড্রেল—আবার চেঁচিয়ে ওঠে করবী।

ইজ সি ম্যাড?

কিন্তু কেউ তার প্রশ্নের জবাব্‌ দেয় না।

বিনয়েন্দ্র তখন পূর্ববৎ শান্ত কণ্ঠে সুব্রতর দিকে তাকিয়েই আবার প্রশ্ন করেন, এ সবের মানে কি সুব্রতবাবু? এরা সব কারা? আর বিমলা তুমিই

বা এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন ?

এবারে সুব্রত কথা বলে, ওকে আপনি চিনবেন না মিঃ ঘোষ ! রথীন রুদ্র, পুলিশ ইনস্পেক্টার, হ্যাঁ—উনি আপনাকে এ্যারেস্ট করতে এসেছেন—

সুব্রতবাবু, ভুলে যাবেন না এটা আমার বাড়ী। এভাবে শেষরাত্রে কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে তার বিনা পারমিশনে প্রবেশ করে—

কিন্তু বিনয়েন্দ্রের কথা শেষ হলো না। সুব্রত বাধা দিয়ে বললে, অনধিকার প্রবেশ কিনা সেটা আদালতই বিচার করবে। উনি এসেছেন আপনাকে এ্যারেস্ট করতে—

এ্যারেস্ট করতে ! তা চার্জটা কি শুনি ?

সে তো একটা আধটা নয়। নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীনাথ করকে হত্যা—

হোয়াট ডু ইউ মিন—চিৎকার করে ওঠে বিনয়েন্দ্র।

নট্ সো ফাস্ট মিঃ ঘোষ, আরো চার্জ আছে। আরো দুটি কলেজ গার্লকে গুম করে তাদের হত্যা করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া এবং ঐ করবীদেবীকে আজ রাত্রে বলপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়ে তার উপরে অত্যাচার—

বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান এখান থেকে—আবার চিৎকার করে ওঠে বিনয়েন্দ্র !

বেরিয়ে নিশ্চয়ই যাবো। তবে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে। আরো চার্জ আছে, আপনার ভাইঝি বেবীকে দু' দুবার হত্যার প্রচেষ্টা—

উঃ বিনয় তুমি, তুমি—বলতে বলতে বিমলাদেবী দুহাতে মুখ ঢাকলো।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন বিনয়েন্দ্র বিমলার দিকে, বিমলা। বিমলা—

না, না—ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না তুমি আমাকে—চিৎকার করে ওঠে বিমলা।

বিমলা, বিমলা—সব, সব মিথ্যা !—

না, না—না !…

বিমলাদেবী সামনের চেয়ারটার উপর বসে পড়ে দুহাতে মুখ ঢেকে যেন মর্মান্তিক এক বেদনায় ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন।

বিনয়েন্দ্র আবার এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই বিমলাদেবীর দিকে সুব্রত হাত তুলে বিনয়েন্দ্রকে বাধা দিল নিঃশব্দে এবং চোখের ইংগীতে পুলিশ ইন্সপেক্টার রথীন রুদ্রকে কি একটা নির্দেশ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে রথীন রুদ্র বিনয়েন্দ্রের একটা হাত চেপে ধরে মৃদু কণ্ঠে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে।

বিনয়েন্দ্র তথাপি বাধা দেবার চেষ্টা করেন কিন্তু পূর্ববৎ মৃদু রীতিমত কঠিন কণ্ঠে এবারে রুদ্র বললেন, আসুন।

এবারে আর বিনয়েন্দ্র দ্বিরুক্তি করলেন না।

রথীন রুদ্রর সঙ্গে সঙ্গে তার আকর্ষণে নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

করবীদেবীকেও সুব্রত এবারে চোখের ইংগীতে ঘর ত্যাগ করতে বললেন।

করবীও বের হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে রইলো কেবল সুব্রত ও দুহাতে মুখ ঢেকে ক্রন্দনরতা বিমলাদেবী একটা চেয়ারের উপর উপবিষ্টা।

আরো কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল।

বিমলাদেবী পূর্ববৎ দুহাতের মধ্যে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদছেন।

সুব্রত আরো একটু এগিয়ে এলো বিমলাদেবীর দিকে।

বিমলাদেবী!

মৃদুকণ্ঠে ডাকলো সুব্রত।

কিন্তু বিমলাদেবী কোন সাড়া দেন না।

আপনার দুঃখ, আপনার লজ্জা, আমি বুঝতে পারছি বিমলাদেবী! কিন্তু—

না, না—সহসা যেন হিষ্টিরিয়াগ্রস্থ রোগিনীর মতই প্রতিবাদে তীক্ষ্ম চাপা কণ্ঠে চিৎকার করে উঠ্‌লেন বিমল্যদেবী, না, না—সুব্রতবাবু, বুঝতে আপনি. পারেননি, পারবেনও না। জানেন না কত বড় মহাপাপ আমি করেছি। এ সব, সবই আমার পাপেরই ফল।

সত্যিই আমি সব জানিনা বিমলাদেবী আর জানারও কথা আমার নয়। তবে অনুমানে যতটুকু বুঝতে পেরেছি।

অনুমান! বিমলাদেবী এতক্ষণে মুখের থেকে হাত সরিয়ে সুব্রতর মুখের দিকে তাকালেন। দু'চোখের কোল বেয়ে অবিরল অশ্রুর ধারা। অপরিসীম বেদনার ছায়া সমস্ত মুখখানি জুড়ে আছে যেন তার। রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, ওর জন্য যে আমি আমার সর্বস্ব একদিন ত্যাগ করেছিলাম সুব্রতবাবু! আমার ইহকাল, পরকাল, সমাজ সব কিছু। আর সমস্ত কিছুর বিনিময়ে যে ওকেই একমাত্র নির্ভর করে আমি বেঁচে থাকতে চেয়েছিলাম!

॥ ছাব্বিশ ॥

চোখের জলের ভিতর দিয়ে অতঃপর বিমলাদেবী শোনালেন এক করুণ কাহিনী! একটি নারী এক শয়তান পুরুষকে ভালবেসে দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর ধরে যে গোপন দুঃখের কাঁটা বুকের মাঝখানে বয়ে বেড়িয়ে নিরন্তর ক্ষত বিক্ষত হয়েছেন তারই করুণ কাহিনী। সুব্রতর অনুমান ভুল হয়েছিল বিমলাদেবীর বয়স সম্পর্কে! এক একজন স্ত্রী পুরুষ আছে যাদের বয়েস হলেও দেহের কোথায়ও বয়েসের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে না বিমলাদেবী ছিলেন তাদেরই দলের, সুব্রত বুঝতে পারেনি।

বিমলাদেবীর বয়স অনেক হয়েছিল। চুয়াল্লিশ। কিন্তু তাকে দেখলে তা মনে হতো না। মনে হতো বুঝি ত্রিশের কোঠাও তখনো উত্তীর্ণ হয়নি।

বিমলা—নরেন্দ্র আর বিনয়েন্দ্রর দূর সম্পর্কীয় মাসতুত বোন। বিমলার

জননী মমতাময়ী বিধবা হবার পর, এক প্রকার নিঃসম্বল অবস্থাতে নয় বছরের একমাত্র কন্যা বিমলার হাত ধরে এসে একদিন ঐ ঘোষ পরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন ওদের পিতার দয়াতেই। এবং ঘোষ মশায়ই চোদ্দ বছরের সময় বিমলার বিবাহ দেন একটি সৎপাত্র দেখে। কিন্তু বিমলার কপালে সে সুখ টিকলো না। এক বৎসরের মধ্যেই কিশোরী বিমলা স্বামীকে হারিয়ে আবার ঘোষ নিবাসে ফিরে এলেন। একমাত্র কন্যার অকাল বৈধব্যের নিদারুণ আঘাত সইতে পারলেন না মমতাময়ী। এক মাস বাদে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেলেন।

বিমলা আর কোথায় যাবে, ঘোষ নিবাসেই থেকে গেল।

বিনয়েন্দ্র তখন তরুণ যুবক।

বিনয়েন্দ্র চিরদিনই ছিল উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের। ক্রমশঃ এক বাড়ীতে সর্বক্ষণ কাছাকাছি থাকার দরুণ বিমলার প্রতি আকৃষ্ট হলেন বিনয়েন্দ্র।

কেবল বিমলারই প্রতি বিনয়েন্দ্রই যে আকর্ষিত হলেন তাই নয়, বিমলাও বিনয়েন্দ্রের প্রতি আকর্ষিতা হলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা বাড়ীর কেউই জানতে পারলো না।

অমনি ভাবেই হয়তো দীর্ঘ দিন চলতো যদি না ইতিমধ্যে বিমলার মাতৃত্বের সম্ভাবনা দেখা না দিত।

গর্ভের সেই অনাগত শিশুকে সম্ভবনাতেই নষ্ট করে ফেলবার জন্য বিনয়েন্দ্র বিমলাকে অনেক বোঝালেন কিন্তু বিমলা কিছুতেই সম্মত হলো না।

সে দৃঢ় কণ্ঠে বললে, না, বিনয়েন্দ্র তার গর্ভের সন্তানকে স্বীকৃতি না দেয় দিক সে এতবড় মহাপাপ মা হয়ে করতে পারবে না।

পিতাকে বিনয়েন্দ্র যমের মত ভয় করতেন।

ঘুণাক্ষরেও পিতা ঐ কথা জানতে পারলে তাকে নিঃসন্দেহে ত্যেজ্যপুত্র করবেন বিনয়েন্দ্র তা ভাল ভাবেই জানতেন।

দিশেহারা হয়ে পড়লেন বিনয়েন্দ্র।

ঐ সময় একটা সুযোগও সহসা এসে গেল।

বিনয়েন্দ্রদের এক জ্যেঠি তাদেরই আশ্রয়ে ছিলেন, তিনি তীর্থ করতে যাবেন, বিনয়েন্দ্রর পরামর্শ মত বিমলা সেই সঙ্গে তীর্থে যাবার অনুমতি বিনয়েন্দ্রর পিতার কাছ থেকে আদায় করে নিলেন।

এবং বিনয়েন্দ্রই তাদের সঙ্গে করে তীর্থে নিয়ে গেলেন।

প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন করে সকলে এসে উঠলেন কাশীতে।

অশীতিপরা বৃদ্ধা জেঠাইমার চোখে ধুলো দেওয়া বিশেষ কষ্ট ছিল না। তথাপি বিমলা বিনয়েন্দ্রকে বাধ্য করলেন তাকে বিবাহ করে স্ত্রীর স্বীকৃতি দিতে এবং কাশীতেই শৈবমতে উভয়ের বিবাহ হলো এই চুক্তিতে যে বিমলা ইহজীবনে কোন দিন তাদের বিবাহের কথা কাউকে জানাবেন না।

ওদিকে জ্যেঠাইমাকে মন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে কৌশলে বিনয়েন্দ্র তাকে বাকী জীবনটা কাশীতে থাকবার জন্য রাজী করালেন।

বিনয়েন্দ্রের পিতাও অমত করলেন না।

এবং জেঠাইমার সঙ্গে আপাতত বিনয়েন্দ্র ও বিমলা কাশীতেই রইল। কয়েক মাস পরে প্রসবের দিন যখন ঘনিয়ে এলো তখন বিমলা বিনয়েন্দ্রকে বললে, এরপর আর একত্রে সন্তান নিয়ে এক বাড়ীতে জেঠির সঙ্গে তো বাস করা চলবে না। তখন বিমলার ইচ্ছা ও চাপে পড়েই বিনয়েন্দ্র বিমলার পৃথক বাসের ব্যবস্থা করতে সম্মত হলো। এবং যথা সময়ে বিমলা হাসপাতালে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলে।

কিন্তু মুখে সম্মত হলেও মনে মনে বিনয়েন্দ্রের অন্য মতলব ছিল।

হাসপাতাল থেকে ফিরবার পথে বিনয়েন্দ্র কৌশলে বিমলার গর্ভজাত সন্তানটিকে সরিয়ে দিল।

এবং বিমলাকে এনে জেঠাইমার ওখানেই তুললো।

বেচারী হতভাগিনি বিমলা! চোরের বোবা কান্নায় তার বুক ভেঙ্গে যেতে লাগলো অহর্নিশ কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা কাউকেই সে জানাতে পারলো না।

ঐ সময় সুব্রত প্রশ্ন করে, কোথায় যে বিনয়বাবু আপনার নবজাত শিশু পুত্রটিকে সরিয়ে ফেললো কিছুই বুঝতে পারলেন না!

না!

শিশুটিকে নিয়ে দাই একটা টাঙ্গায় ছিল আর আমি তার সঙ্গে অন্য একটা টাঙ্গায় আসছিলাম।

তারপর!

আমাকে এনে তুললো তাদের আগের বাড়ীতেই! আমি তো অবাক। নিজের মনে নিজে ছট্‌ফট্ করছি অথচ কাউকে কিছু বলতে পারি না।

বিনয়বাবুকে বললেন না কেন!

বলবো কি! আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়েই এই আসছি বলে সেই যে সে চলে গেল, ফিরে এলো দশ দিন পরে।

সে কি!

হ্যাঁ! সে দশটা দিন যে আমার কিভাবে কেটেছে? তারপর দশ দিন পরে যখন সে ফিরে এলো জিজ্ঞাসা করলাম—খোকা, আমার খোকা কোথায়?

নেই! সে বললে।

আমি তখন তার পায়ের উপরে আছড়ে পড়ে কেঁদে বললাম, ওগো আমার ছেলে আমাকে ফিরিয়ে দাও, তোমাকে কথা দিচ্ছি যেদিকে দু' চোখ যায় আমি আমার ছেলেকে নিয়ে চলে যাবো। কেউ ঘুণাক্ষরেও কোন দিন

জানতে পারবে না এ সব কথা।

কিন্তু বিনয়েন্দ্র বললে, না, তা হয় না বিমলা।

কেন, কেন হয় না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

কেন ব্যস্ত হচ্ছো বিমলা। তোমার ছেলে বেঁচেই আছে।

না, না—আর তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না গো, আর তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না। তাকে তুমি ফিরিয়ে দাও।

মিথ্যে ব্যস্ত হচ্ছো বিমলা তুমি, আমি বলছি, সময় হলেই তোমার ছেলেকে তুমি পাবে।

কতবার পায়ে ধরে কাঁদলাম কিন্তু সে আমার কোন কথাই শুনলো না।

বিমলা কাঁদতে লাগলেন।

তারপর।

মাস কয়েক বাদে আবার একদিন আমরা কাশী থেকে কলকাতায় ফিরে এলাম।

কিন্তু আপনি বিনয়বাবুকে ভয় দেখালেন না কেন যে সব কথা প্রকাশ করে দেবেন।

তাও দেখিয়েছি কিন্তু তাতে সে কি জবাব দিয়েছিল জানেন সুব্রতবাবু।

কি?

বলেছিল সে তাহলে আমার সন্তানকে হত্যা করবে।

শয়তান। স্কাউন্ড্রেল। তারপর এই সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বছরের মধ্যে আর কোন সন্ধানই আপনি আপনার ছেলের পাননি।

পেয়েছি—কিন্তু সে সংবাদ বোধহয় না পেলেই ভাল হতো।

কেন?

ছেলেকে নিয়ে শ্রীরামপুরের এক স্বামীজীর অনাথ আশ্রমে রেখে এসেছিল সে।

অনাথ অশ্রমে?

হ্যাঁ।

এবং সেখানেই যখন তার আঠারো বছর বয়েস সেই সময় হঠাৎ আশ্রমে আগুন লাগে—

তারপর।

সেই আশ্রমের মধ্যে আগুন ধরার দিন সে ও অন্য একটি ছেলে মনোহর যে কোথায় আশ্রম থেকে সরে পড়লো আর তাদের কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি।

মনোহর?

হ্যাঁ, মনোহর শিকদার।

চকিতে ঐ সময় একটা কথা সুব্রতর মনে পড়ে যায়। মনোহর শিকদার।

কোন্ মনোহর শিকদার। ঘোষ কোম্পানীর অফিসের মনোহর শিকদার নয় তো। যে বর্তমান পুলিসের হেফাজতে আছে।

আচ্ছা মিসেস ঘোষ—

সুব্রতর ডাকে চমকে মুখ তুলে তাকালো বিমলা তার দিকে।

চমকে উঠলেন কেন। সত্যিই তো আপনি আইনত ও ধর্মত এই ঘোষ বাড়ীরই বধূ।

না, না—সুব্রতবাবু, ও পরিচয় আর আমার আজ প্রয়োজন নেই। বিমলা কলঙ্কিনীই থাক।

আচ্ছা একটা কথা বিমলাদেবী।

বলুন।

শ্রীরামপুরের অনাথ আশ্রমে আপনার সেই ছেলের কি নাম ছিল কিছু জানেন।

প্রথমে জানতাম না কিন্তু পরে জেনেছিলাম। কারণ আশ্রমে আগুন লেগে পুড়ে যাবায় পরের দিন ওর সঙ্গে গাড়িতে করে সেই আশ্রমে যাবার পর স্বামীজির মুখেই শুনেছিলাম তার নামটা।

আপনি গিয়েছিলেন আশ্রমে ?

হ্যাঁ, সেইখানেই স্বামীজি স্বরূপানন্দর মুখে সব কথা শুনি। নচেৎ ওর মুখের কথায় কোন দিনই আমি বিশ্বাস করতাম না।

কিন্তু সেও তো সব সাজানো ব্যাপার হতে পারে বিনয়বাবুরই।

না। সাজানো নয়, সব সত্যি। কিন্তু যা বলছিলাম, স্বামীজির মুখেই প্রথম শুনেছিলাম, আমার ছেলের নাম ছিল অনিমেষ।

কি। কি বললেন বিমলাদেবী। ভূত দেখার মতই যেন চমকে ওঠে সুব্রত।

অনিমেষ।

হ্যাঁ, অনিমেষ। এবং স্বামীজির পূর্বাশ্রমের নামের পদবী অনুসারে তিনি তাকে পিতৃত্ব দিয়ে স্বীকৃতি দেওয়ায় আশ্রমে তার নাম ছিল অনিমেষ হালদার।

সুব্রত বিমলাদেবীর শেষের কথাটায় যেন একেবারে পাথর হয়ে যায়।

ক্ষণপূর্বের একটি রক্তাক্ত বিভৎস দৃশ্য তার চোখের দৃষ্টির সামনে যেন ভেসে ওঠে চকিতে।

অনিমেষ। অনিমেষ হালদার তাহলে অজ্ঞাত অপরিচিত নয়, এই বিমলা ও বিনয়েন্দ্ররই সন্তান।

কিন্তু সুব্রতবাবু, আপনি—আপনি নামটা শুনে অমন করে চমকে উঠলেন কেন। আপনি—

আমি।

হ্যাঁ, বলুন, বলুন—শুধু বলুন আজো কি সে বেঁচে আছে।

আপনি এই ঘরে একটু অপেক্ষা করুন বিমলাদেবী, আমি এখুনি আসছি। বলেই সুব্রত তড়িৎপদে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ সাতাশ ॥

রাত্রিশেষের আলোর আভাষ পূর্বদিগন্তে তখন একটু একটু করে ফুটে উঠছে।

সুব্রত এসে পাশের ঘরে ঢুকলো।

যে ঘরে সতর্ক প্রহরায় তখনো একটা চেয়ারে বিনয়েন্দ্রকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল।

সামনেই অবশ্য আর একটা চেয়ারে বসে ছিলেন ইনস্পেক্টার রথীন রুদ্র। করবী বাড়ী চলে গিয়েছিল।

পদশব্দে সকলেই সুব্রতর দিকে মুখ তুলে তাকালেন।

বিনয়েন্দ্রবাবু!

বিনয়েন্দ্র সুব্রতর গম্ভীর কণ্ঠে মুখ তুলে তাকালো।

অনিমেষ হালদারকে চেনেন।

কে! চমকে তাকাল বিনয়েন্দ্রবাবু সুব্রতর মুখের দিকে।

অনিমেষ হালদার।

কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে যেন সামলে নিয়েছেন বিনয়েন্দ্র। কঠিন কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিলেন, না!

জানেন না!

না!

কিন্তু বিমলাদেবী, আপনার স্ত্রী—

কে!

আপনার স্ত্রী বিমলাদেবী, সব কথাই আমাকে বলেছেন।

তাই যদি বলে থাকে তো আমায় আবার জিজ্ঞাসা করছেন কেন!

জিজ্ঞাসা করছি এই জন্য যে, আপনি কি জানেন দীর্ঘ নয় বৎসর আগে শ্রীরামপুরের এক অনাথ আশ্রম থেকে অনিমেষ নামে যে ছেলেটি আশ্রমে অগ্নিকান্ডর গোলমালের মধ্যে অকস্মাৎ নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিল সে এখন কোথায়!

না!

সে আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনি জানেন না! কিন্তু মনোহর শিকদার, সেও আপনাকে কিছু বলতে পারেনি—

মনোহর!

হাঁ, সে তো আপনারই আশ্রয়ে ছিল দীর্ঘদিন, আপনার যত কুকীর্তির

দক্ষিণ হস্ত রূপে।

বিনয়েন্দ্র চুপ করে থাকেন।

কোন সাড়াই আর দেন না!

কিন্তু আমি জানি আপনার সেই নিরুদ্দিষ্ট ছেলে এখন কোথায়!

কোথায়!

দেখতে চান!

নিশ্চয়ই!

বেশ। তবে চলুন—উঠুন—

ক্রমে ভোরের আলোয় প্রকৃতি তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রথমে জীপ গাড়িটা ও তার পশ্চাতে কালো রঙের পুলিশ ভ্যানটা এসে ব্যারাকপুর রোডে মতিঝিলের গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো।

মতিঝিলের সর্বত্র তখন লাল পাগড়ী পাহারা দিচ্ছে।

জীপ থেকে সুব্রত ও রথীন রুদ্র নামলো তারপর তারা এগিয়ে গিয়ে প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় বিনয়েন্দ্রকে পুলিশ ভ্যান থেকে নামালো।

বিনয়েন্দ্র একেবারে নিশ্চুপ, মুখে কোন শব্দ পর্যন্ত নেই।

বারান্দা দিয়ে উঠে হলঘরের দিকে যেতে যেতে সুব্রত বললে, চিনতে আশা করি কষ্ট হচ্ছে না বিনয়েন্দ্রবাবু, আপনার লীলা নিকেতন 'মতিঝিল'কে।

বিনয়েন্দ্র কোন জবাব দেন না!

এগিয়ে গিয়ে সকলে প্রহরী বেষ্টিত বিনয়েন্দ্রকে নিয়ে রাত্রের সেই কক্ষে প্রবেশ করলো, যে কক্ষে কয়েক ঘণ্টা পূর্বে একটা রক্তাক্ত দৃশ্যের মর্মন্তুদ অভিনয় হয়ে গিয়েছে। সকলে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করতেই যে দুজন পুলিশ প্রহরী ঘরের মধ্যে দণ্ডায়মান ছিল তারা সরে দাঁড়ালো সসম্ভ্রমে।

মেঝের উপরেই তখনো ঢাকা কম্বলে অনিমেষের মৃতদেহটা শায়িত ছিল। সুব্রতই সর্বাগ্রে এগিয়ে গিয়ে সেই কম্বলে আবৃত মৃতদেহটার সামনে দাঁড়ালো, তারপর যেন মুহূর্তকাল একটু ইতস্তত করে সহসা নিচু হয়ে মৃত-দেহের উপর থেকে কালো কম্বলটা একটানে সরিয়ে দিয়ে, বিনয়েন্দ্রর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, দেখুন তো বিনয়েন্দ্রবাবু, এই হতভাগাকে চিনতে পারেন কি না!

বিনয়েন্দ্রর চোখে মুখে কোনরকম পরিবর্তনই দেখা গেল না।

তিনি বারেকের জন্য মেঝের উপর শায়িত অনিমেষের প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহটার দিকে তাকিয়েই পুনরায় দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলেন।

চিনতে পারছেন না আশ্চর্য! মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে আপনি একেই মারাত্মক রকম আঘাত করায় কিছুক্ষণের মধ্যেই এর মৃত্যু হয়েছে। একে কিন্তু আপনার চিনতে পারা উচিত ছিল।

বিনয়েন্দ্র নির্বাক।

ভাল করে চেয়ে দেখুন, সুব্রত আবার বলে, নয় বৎসর পূর্বে অনাথ আশ্রমে পরিত্যক্ত আপনার সেই ছেলেই এই অনিমেষ বিনয়বাবু!

মুহূর্তে যেন বিনয়েন্দ্রের পাথরের মত দেহে প্রাণ সঞ্চার হলো।

অস্ফুট আর্ত চিৎকার করে ওঠেন বিনয়েন্দ্র, য়্যাঁ—

হ্যাঁ মিঃ ঘোষ! আপনার অপরিসীম পাপের, আপনার কলঙ্কিত পিতৃত্বের ঋণ শোধই ওই বেচারী করেছে আজ, আপনারই দেওয়া প্রাণটা আপনারই হাতে তুলে দিয়ে।

না, না—বিশ্বাস করি না, এ আমি বিশ্বাস করি না। পাগলের মতই যেন চিৎকার করে উঠ্‌লেন বিনয়েন্দ্র।

বিশ্বাস না করলেও কথাটা কঠিন সত্য! আপনিই আপনার নিজের ঔরসজাত সন্তানকে নিজের হাতে আজ হত্যা করেছেন।

দু' হাতের মধ্যে এবারে মুখ ঢেকে বিনয়েন্দ্র বললেন, আমাকে এ ঘর থেকে নিয়ে চলুন, দয়া করুন, দয়া করুন, দয়া করুন।

সুব্রত চোখের ইংগীত করলো বিনয়েন্দ্রকে অন্যত্র নিয়ে যাবার জন্য।

সকলে এসে মতিঝিলের লাইব্রেরী ঘরে পুনরায় প্রবেশ করলেন।

আমি বসতে পারি একটু মিঃ রায়। ক্লান্ত অবসন্ন নিষ্প্রাণ কণ্ঠে যেন বিনয়েন্দ্র বললেন।

নিশ্চয়ই, বসুন—

সুব্রতর অনুমতি পেয়ে বিনয়েন্দ্র একটা সোফার উপরে ঝুপ্‌ করে বসে পড়লেন। এবং দু'হাতে নিজের মুখ ঢাকলেন।

ঘরের মধ্যে সুব্রত ও মিঃ রুদ্র এবং অন্য দুজন আর্মড্‌ সার্জেন্ট নিকটে দাঁড়িয়ে। বরফের মত একটা জমাট স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে থম্‌ থম্‌ করতে থাকে।

দেওয়ালে টাঙ্গানো সুদৃশ্য জার্মান ক্লকটা কেবল এক ঘেয়ে টক্‌ টক্‌ শব্দ তুলে সময় সমুদ্রের বুকে স্পন্দন জাগিয়ে চলেছে।

সকলেরই দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ, অদূরে হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে চেয়ারের উপরে উপবিষ্ট বিনয়েন্দ্রর দিকে।

ধীরে ধীরে এক সময় মুখ তুললেন বিনয়েন্দ্র। এবং ম্লান অবসন্ন কণ্ঠে বললেন, মিঃ রায়। সব আমি বলবো—কিছুই আর গোপন করবো না। আমার সমস্ত অপরাধের স্বীকৃতি আমি নিজ মুখেই দেবো।

সুব্রত কোন কথা বলে না।

বিনয়েন্দ্র একটু থেমে আবার বলেন, কিন্তু তার আগে সামান্য একটু ফেভার যদি আপনাদের কাছে আমি চাই—

নিশ্চয়ই, বলুন—

ঐ যে দেখছেন আলমারিটা, ওটা খুলে দেখুন একটা বোতল আর পেগ গ্লাস আছে, যদি একটা পেগ এলাও করেন।

বিনীত করুণ কণ্ঠে কথাগুলো বলে অনুনয়ভরা দৃষ্টিতে তাকালেন বিনয়েন্দ্র সুব্রতর মুখের দিকে।

সুব্রত মুহূর্তকাল যেন কি ভাবলো তারপর তাকালো পাশেই দণ্ডায়মান ইন্সপেক্টার রথীন রুদ্রর দিকে।

রুদ্র মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালেন, বেশতো দিন—

এবারে সুব্রতই নিজে এগিয়ে গেল নির্দিষ্ট কাচের দেওয়াল আলমারিটার দিকে। আলমারির দরজা খোলাই ছিল। পাশাপাশি দুটো কালো ছোট ভ্যাট্ 69এর বোতল ছিল। একটা সম্পূর্ণ বোতল, সিলই খোলা হয়নি। অন্য অর্ধেকখালি। পাশেই ছিল একটা পেগ গ্লাস।

সুব্রত সিল খোলা বোতল থেকে পেগ গ্লাসে এক পেগ পরিমাণ তরল পদার্থ ঢেলে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল, বিনয়েন্দ্র বললেন তাড়াতাড়ি, না, না—এমনি 'র'ই দিন।

সুব্রত এগিয়ে এসে পেগ গ্লাসটা বিনয়েন্দ্রের হাতে দিল।

পেগ গ্লাসটা হাতে ধরে দৃষ্টির সামনে তুলে আবার বিনয়েন্দ্র সুব্রতর দিকে তাকালেন।

সহসা ঐ সময় কি একটা অজানিত আশংকায় মুহূর্তের জন্য সুব্রত যেন কেঁপে ওঠে, বিনয়েন্দ্রর চোখে মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠতে দেখে।

কিন্তু তার আগেই যা ঘটবার ঘটে গিয়েছে।

এক চুমুকে হাতে পেগ গ্লাসটা শেষ করেই সেটা অবহেলা ভরে বিনয়েন্দ্র ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

ঝন্‌ঝন্ শব্দে কাঁচের পেগ গ্লাসটা শতধায় চূর্ণ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে গেল এবং সশব্দে বিনয়েন্দ্রের অসাড় দেহটা চেয়ারের উপর থেকে মেঝেতে গড়িয়ে পড়লো পর মুহূর্তেই।

মাত্র কয়েকটি যন্ত্রণাকাতর দেহের আক্ষেপ, তারপরই সব স্থির।

ঘরের মধ্যে সকলেই হতভম্ব ঘটনার আকস্মিকতায়।

রথীন রুদ্র তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছিল, মৃদু শান্ত কণ্ঠে সুব্রত তাকে বাধা দিল, হি ইজ্ ডেড্ রথীনবাবু।

ডেড্!

হ্যাঁ, খুব সম্ভবতঃ পটাসিয়াম সায়ানাইড।

পটাসিয়াম সায়ানাইড্।

হ্যাঁ, যে মৃত্যু বিষ কৌশলে প্রয়োগ করে একদিন ঐ বিনয়েন্দ্র তার জ্যেষ্ঠ ভাই নরেন্দ্রনাথকে হত্যা করেছিল, সেই বিষই উনি ঐ লিকারের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, আমারই সাবধান হওয়া উচিত ছিল কিন্তু—

উঃ ইট ওয়াজ সো আনএক্সপেক্টেড—রথীন রুদ্র মৃদু কণ্ঠে বললেন কেবল।

হ্যাঁ। কিন্তু এখানে আর দেরি করে লাভ নেই এখনি আবার আমাদের একবার বিনয়বাবুর বালীগঞ্জের বাড়ীতে যেতে হবে, যেখানে বিমলাদেবীকে একা রেখে এসেছি।

কিন্তু সেখানেও পেঁছিতে দেরি হয়ে গিয়েছিল সুব্রতর।

বালীগঞ্জে পেঁছে বিমলা দেবীর খোঁজ করতে গিয়ে জানতে পারলো, বিমলাদেবী নেই। বেবীও জানে না, এমন কি দাসদাসীরাও টের পায়নি কখন এক সময় ইতিমধ্যে বিমলাদেবী নিঃশব্দে তার এতদিনকার আশ্রয়, এত কলঙ্ক, দুঃখ ও বেদনার আশ্রয়টি ত্যাগ করে কোথায় চলে গিয়েছেন।

॥ আটাশ ॥

বিমলাদেবীর আর কোন অনুসন্ধান না পাওয়া গেলেও তার ঘরে একটি চিঠি পাওয়া গেল।

চিঠিখানি খামের মধ্যে ভরে মুখ এঁটে সুব্রতর নামই উপরে লিখে শয্যার বালিশের উপরে রেখে গিয়েছেন বিমলাদেবী।

খামটা ছিঁড়ে সুব্রত চিঠিটা দৃষ্টির সামনে মেলে ধরলো।

সুব্রতবাবু!

আর কেউ না বুঝলেও আশা করি আপনি বুঝলেন এ বাড়ী ছেড়ে এরপর চলে যাওয়া ছাড়া আর আমার সামনে দ্বিতীয় কোন পথই ছিল না। তাই আপনি ফিরে আসবার পূর্বেই চিরদিনের মত এবাড়ী ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি। যাবার পূর্বে একটা শুধু, একটি মাত্র অনুরোধ, যত পাপ, যত কুকৃত্তিই আমি করে থাকি না কেন, নিশ্চয়ই বুঝলেন সবই আমাকে করতে হয়েছিল আমার স্বামীরই নির্দেশে। হয়ত আপনি বলবেন অন্যায় জেনেও কেন নির্বিকারে তার সব আদেশ পালন করে এই মহাপাপ করেছি। তার জবাবে বলবো, শুধু তিনি আমার স্বামীই ছিলেন না, পৃথিবীতে এমনি করে আমার মত বোধহয় খুব কম স্ত্রীই তার স্বামীকে ভালবাসতে পেরেছে। এবং সেই ভালবাসার কাছেই আমার সমস্ত পাপ পুণ্য, ইহকাল পরকাল একাকার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যাক সে কথা। আমার সমস্ত কথা, সমস্ত প্রশ্ন ও তার সমস্ত মীমাংসা আমি আমারই সঙ্গে নিয়ে চললাম। তাই চির বিদায়ের পূর্বে এই শেষ অনুরোধ, আমার সন্ধান আর করবেন না দয়া করে।

অন্তত এই লজ্জায় আমাকে অন্যের অগোচরে মুখ ঢেকে থাকবার ক্ষমাটুকু দেবেন। আর একটি কথা। আমার ভাসুর নরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর ব্যাপারে প্রথম দিন আমার স্বামীরই নির্দেশ মত নির্মলের বিরুদ্ধে যে আপনাদের কাছে জবানবন্দী দিয়েছিলাম, জানবেন তা সবই মিথ্যা! নির্মল সম্পূর্ণ নির্দোষ। এখন বুঝতে পারছি, করবীদেবীর ব্যাপারে তার প্রতি আক্রোশ-বশতঃই তিনি ঐ ব্যাপারে নির্মলকে ফাঁসাতে চেয়েছিলেন, তাকে সরাতে চেয়েছিলেন খুনের অপরাধ তার কাঁধের উপরে চাপিয়ে। আজ নির্মলবাবু বেঁচে থাকলে তাঁর কাছেও আমি মার্জনা চেয়ে যেতাম। সেইদিন দ্বিপ্রহরে, আমিই ডাকের চিঠিগুলো আমার ভাসুরের হাতে সামার হাউসে পেঁছে দিই। এবং আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার স্বামীর নির্দেশেই লজ্জার মাথা খেয়ে আমাকে আমার পূজনীয় ভাসুরের সঙ্গেও প্রেমের অভিনয় করতে হয়েছিল। পাপীয়সী আমি তাই তার মত লোকের সঙ্গেও প্রেমের অভিনয় করতে হয়তো আমার বাধেনি। কিন্তু বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা, ঐ ফিল্ম রোলের মধ্যে যে মারাত্মক বিষ মেশানো ছিল তা আমি ঘুণাক্ষরেও জানতাম না। পরে অবশ্য আমি অনুমান করেছিলাম। আর এও আমি জানতাম না যে, তিনি তার ভাইঝি বেবীকে মারবার চেষ্টা করবেন। তাহলে আমিই বাধা দিতাম। বেবীর কাছে পৃথক চিঠি দেবার আমার আর কোন মুখ নেই বলেই দিলাম না। তাকে বলবেন অভাগিনী বিমলাকে কোনদিন যদি সে ক্ষমা করতে পারে তো যেন করে।

ইতি—

হতভাগিনী বিমলা।

কি জানি কেন বিমলার শেষ চিঠিটা পড়তে পড়তে সুব্রতর দু'চোখের কোলে জল ভরে আসে।

বেবী পাশেই দাঁড়িয়েছিল তখনো। সে মৃদু কণ্ঠে শুধায়, কি লিখেছেন পিসিমা চিঠিতে সুব্রতবাবু!

চিঠির কথা তুমি জিজ্ঞাসা করো না বেবী। মৃদু কণ্ঠে সুব্রত বলে।

কেন!

তাও শুনতে পাবে না তুমি।

বেশ!

একবার ভেবেছিল সুব্রত বিমলাদেবীর সত্যিকারের তাদের সঙ্গে পরিচয়টা বেবীর কাছে খুলে বলে কিন্তু পরক্ষণেই কি ভেবে সেটা আর বললে না।

যাদের নিয়ে কথাটা তাদের একজন যখন সমস্ত কিছুর বাইরে চিরদিনের মতই নিরুদ্দেশ হয়ে গেল তখন সে দুঃখ ও কলঙ্ককে নতুন করে জাগিয়ে তুলে কিই বা আর লাভ।

তাদের গোপন কথা গোপনই থাক।

বিমলা! দুঃখিনী বিমলা হারিয়ে গিয়েছে, হারিয়েই যাক।

ঐ ঘটনার আরো দিন দুই পরে।

নির্মল চৌধুরী নিজে থেকেই গিয়ে পুলিশের কাছে ধরা দিয়ে সব স্বীকৃতি দিয়েছে।

থানার সুশীল সোমের অফিস ঘরে বসে সুব্রত বলছিল, মুনি ঋষিরা ঠিকই বলে গিয়েছেন সুশীলবাবু—

কি?

নরনারীর প্রেমের ব্যাপারটা দেবতারই বোধগম্য নয় তো মানুষ তো কোন্ কথা।

কার কথা বলছেন মিঃ রায়?

সুব্রত তখন পর্যন্ত বিমলাদেবীর সমস্ত কাহিনী সুশীল সোমকে জানায়নি। ধীরে ধীরে সংক্ষেপে সে বিমলার কাহিনী বলে গেল।

সব শুনে সুশীল সোম বললেন, আশ্চর্য—

তাই, নইলে হতভাগিনী দূর সম্পর্কীয়া বলে বিধবা মাসতুতো বোন বিমলাদেবী বিনয়েন্দ্রের মত এক নরপিশাচকে কেমন করে অমন গভীর ভাবে ভালবাসতে পারলো। আর সেই ভালবাসারই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নরপিশাচ বিনয়েন্দ্র হতভাগিনী বিমলাকে শেষ পর্যন্ত হাতের ক্রীড়নকে পরিণত করতে পেরেছিল। হতভাগিনীর জন্য সত্যিই আমার দুঃখ হয় মিঃ সোম! জানিনা সে কোথায় গিয়েছে তবে যেখানেই যাক না কেন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যিনি মানুষের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন তাঁর ক্ষমা থেকে ঐ দুঃখিনী যেন বঞ্চিতা না হয়!

তারপর একটু থেমে আবার সুব্রত বলে, তাই বলছিলাম বিচিত্র এই নর-নারীর প্রেমের ব্যাপারটা। দুর্জ্ঞেয় অপার। জন্মমুহূর্তে শয়তান পিতার দ্বারা পরিত্যক্ত, চির অবহেলিত, নাম গোত্র পরিচয়হীন এক কুৎসিত পুরুষ, ঐ অনিমেষ, করবীকে ভালবেসে হাসতে হাসতে তার জন্য প্রাণ দিয়ে গেল। আর এক নারী পাকেচক্রে অসামাজিক প্রেমের কলঙ্ক চিরদিন নিঃশব্দে মাথায় বয়ে, নিঃশব্দে কোথায় গিয়ে লজ্জায় মুখ ঢাকল। এবং এদের দুজনেরই এই মর্মন্তুদ পরিণতির জন্য দায়ী হচ্ছে ঐ নরপশু বিনয়েন্দ্র!

সুশীল সোম ঐ সময় বাধা দিয়ে বললেন, কিন্তু বংশী ওরফে অনিমেষের চোরা মাদকদ্রব্যের কারবারে নিজেকে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত করে রাখার ব্যাপারটা কি সেদিক দিয়ে একটু বিচিত্রই মনে হয় না সুব্রতবাবু।

হয় বৈ কি! সুব্রত জবাবে বলে, তবে সেজন্যও অনিমেষের চাইতে তার জন্মদাতা পিতা, বিনয়েন্দ্রকেই আমি বেশী দায়ী করবো।

কিন্তু সে ব্যাপারে তার বাবা দায়ী হতে যাবে কেন!

নিশ্চয়ই, সেই দায়ী বইকি। দুষ্কৃতিকারী ও ক্রিমিন্যাল মাইণ্ডেড তার পিতার চরিত্রগত ক্রাইমের টেনডেনসিই ছাপ ফেলেছিল তার ঔরসজাত পুত্রেরও চরিত্রে। কিরীটি বলে এ হচ্ছে চরিত্রের ক্রোমোজোম ফ্যাকটার। এবং সেই জন্মগত পাপের টেনডেনসিকেই ধূমায়িত করেছে ইন্ধন জুগিয়ে জুগিয়ে মনোহর।

আপনি এ থিয়োরী বিশ্বাস করেন সুব্রতবাবু!

করি বৈ কি! এবং পৃথিবীতে মানব চরিত্রে যে সব জঘন্য ক্রাইম দেখা দেয় বেশীর ভাগ তাদের মূলেও আমার মতে ঐ থিয়োরীটি খুব বড় কথা।

কিন্তু—

মনোহর শিকদার কাল যে জবানবন্দী দিয়েছে আপনার কাছে সেটাও ভেবে দেখুন মিঃ সোম।

স্বরূপানন্দর শ্রীরামপুরের আশ্রমে থাকাকালীন সময়ে মনোহরের সঙ্গে অনিমেষের বন্ধুত্ব জন্মায়। এবং মনোহর হচ্ছে এক দুর্ধর্ষ খুনী মা বাপের সন্তান। অনিমেষের মনোহরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার মূলেও ছিল তার জন্মগত চরিত্রের ক্রাইমেরই বৈশিষ্ট। আর সেই কারণেই মনোহর ও অনিমেষের দুষ্কৃতির জন্য স্বরূপানন্দ তাদের তিরস্কার করায়, মনোহরেরই পরামর্শে অনিমেষ আশ্রমে একদিন রাত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়। এবং সেই সময়েই ঘটনাচক্রে অনিমেষের মুখটা অগ্নিদগ্ধ হয়ে বিকৃত হওয়ায় ও ধরা পড়বার ভয়ে মনোহরেরই পরামর্শে দুজনে আশ্রম থেকে সে রাত্রে পালায়। তারপর নানা ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়ে মনোহর ও অনিমেষ দুজনে দুদিকে ছিটকে পড়ে। মনোহর নানা দুষ্কৃতিকারীদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে অবশেষে সন্তোষ মিত্র বেসী বিনয়েন্দ্রর দলে গিয়ে ভেড়ে আর অনিমেষ কালু খাঁর সঙ্গে মিশে শেষপর্যন্ত তার কারবারের সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের চরিত্রেই যে কিছু না কিছু সৎ প্রবৃত্তি থাকে, সেই সৎ প্রবৃত্তিই অবশেষে একদিন অনিমেষের সর্বপাপের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল করবীদেবীর সংস্পর্শে আসবার পর ধীরে ধীরে। দুস্কৃতির মধ্যে জন্ম নিয়েছিল শুদ্ধ প্রেম, ভালবাসা। যে ভালবাসাই তাকে অন্ধের মত টেনে নিয়ে গিয়েছিল তার অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু পরিণতির মধ্যে। সত্যিকারের ভালবাসা ও প্রেম এমনি করেই সময়ে সময়ে মানুষের চরিত্রগত নীতি ও সংস্কারকে পর্যন্ত ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে যায়। এবং করবীদেবী যদি অনিমেষের জীবনে না আসতো তবে হয়তো আজকের অনিমেষকে কোনদিনই আমরা চোরা কারবারী অনিমেষের মধ্যে জন্ম নিতে দেখতাম না! তার ক্রিমিন্যাল বাপের মতই সেও হয়তো একদিন পাপের দুর্নিবার স্রোতের মধ্যেই লুপ্ত হয়ে যেতো। তাইতো যখনই আমার অনিমেষ ও তার হতভাগিনী মা বিমলাদেবীর কথা

মনে পড়ে, তখন চোখে জল এসে যায়। ভাবি কি এমন অপরাধে বিমলা স্বামী পেয়েও স্বামী পেল না। সংসারের আর দশজন নারীর মতই দয়িতকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেও ইহজীবনে সে ভালবাসার স্বীকৃতি তো পেলই না, বরং লজ্জা ও কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে শেষপর্যন্ত নিঃশব্দে কোথায় হারিয়ে গেল। নারীর চিরআকাঙ্খিত সন্তানকে বুকে পেয়েও ইহজীবনে মা ডাক শুনতে পেল না। বলতে বলতে সুব্রতর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে!

ঘরের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক স্তব্ধতা যেন থম্ থম্ করতে থাকে।

সত্যি, একটি মাত্র মানুষের দুষ্কৃতির মূল্য শোধ করতে গিয়ে আর দুটি নিরপরাধ নিষ্পাপ মানুষের এই যে চরম পরিণতি ভাবতেও বিস্ময় লাগে সুব্রতবাবু!

এমনি করে যে কত নিষ্পাপ নিরপরাধীকে আর একজনের পাপের মাশুল দিয়ে যেতে হয় মিঃ সোম সময়ে সময়ে,—বলে একটা দীর্ঘশ্বাস রোধ করে সুব্রত। তারপর একটু থেমে আবার বলে, যাক যা বলছিলাম—

কিরীটি যখন বিমলাদেবী সম্পর্কে বার বার আমাকে সতর্ক হতে বলেছিল তখন বুঝিনি যে, এমনি একটা জটিল রহস্য নরেন্দ্রনাথের হত্যা ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে আছে। নরেন্দ্রনাথ বা শ্রীনাথ করকে হত্যার ব্যাপারটা তবু কিছুটা বোঝা যায় কিন্তু বেবীকে হত্যাপ্রচেষ্টা সত্যিই আমাকে প্রথমটায় বিস্মিত করে দিয়েছিল। আর সত্যি কথা বলতে কি, বেবীকে হত্যার প্রচেষ্টা না করলে হয়তো কোনদিনই আমার দৃষ্টি বিনয়েন্দ্রের উপর গিয়ে কেন্দ্রীভূত হতো কিনা সন্দেহ।

কিন্তু কালও নমিতাদেবী বলছিলেন তার কাকা যে তাকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছেন এখনো তিনি তা বিশ্বাস করতে পারছেন না। সুশীল সোম বললেন।

স্বাভাবিক। কিন্তু অর্থ এমনই অনর্থের ব্যাপার সুশীলবাবু যে, সে লোভের কাছে অতি বড় স্নেহের পাত্রও তুচ্ছ হয়ে যায়। এর প্রমাণ শুধু এবারই নয় আগেও অনেকবার পেয়েছি। বেবীকে হত্যা প্রচেষ্টার ব্যাপারে যে শুধু বিনয়েন্দ্রের দিকেই দৃষ্টি আমার কেন্দ্রীভূত হয় তাই নয়, অর্থই যে এক্ষেত্রে অনর্থ ঘটিয়েছে অর্থাৎ 'মোটিভ' যে অর্থই সেটাও আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমাদের দৃষ্টি কিন্তু আদপেই ওদিকে যায়নি।

না যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ প্রথমতঃ অনেকদিন আগেই বিনয়েন্দ্র পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন, দূরেও থাকতেন দাদার কাছ থেকে।

আচ্ছা সুব্রতবাবু, একটা ব্যাপার এখনো আমার কাছে স্পষ্ট হচ্ছে না, বিমলাদেবী যদি সত্যি সত্যিই বিনয়েন্দ্রের স্ত্রী ছিলেন তাহলে তিনি বিনয়েন্দ্রের কাছে না থেকে নরেন্দ্রবাবুর গৃহে ছিলেন কেন? সুশীল সোম

প্রশ্ন করেন।

আমার যতদূর মনে হয় সেটাও হয়ত বিনয়েন্দ্রই পরামর্শে। আগেই আপনাকে বলেছি, অত্যন্ত চতুর প্রকৃতির শয়তান ছিল লোকটা। তার সর্ব কিছু একেবারে ধীরে সুস্থে প্ল্যান করে করা। খুব ধীরে ধীরে পা ফেলে ফেলে এগিয়েছিল বিনয়েন্দ্র। প্রথমতঃ, বিমলাকে সঙ্গে নেয়নি তার কারণ ছিল, হয়ত তাহলে নরেন্দ্রনাথের হত্যার ব্যাপারে বিমলার কাছ থেকে যে সাহায্যটা সে পেয়েছিল সেটা পেত না। দ্বিতীয়তঃ, বিমলার কাছাকাছি থাকলে তার অন্য নারীর প্রতি আসক্তির ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে যাবারও একটা ভয় ছিল মনে মনে। তাছাড়া বিমলার মত বিনয়েন্দ্র কোনদিনই তো তাকে সত্যিকারের ভালবাসেনি। সে যাক্ যা বলছিলাম। নরেন্দ্রনাথেরও যে বিমলার প্রতি একটা দুর্বলতা আছে সেটা বিনয়েন্দ্রর অজ্ঞাত ছিল না। আর সেইটাই তার কার্যসিদ্ধির ব্যাপারে বিমলার দ্বারা হয়েছিল প্রধান অস্ত্রস্বরূপ। পূর্ববৎ সব প্ল্যান করে এবং যেহেতু বেচারী নির্মল তার আকাঙ্খিতাকে ভালবাসে সেই আক্রোশে একই ঢিলে দুই পাখী মারবার মতলবে, শ্রীনাথ করের সাহায্যে নরেন্দ্রর মনটা ক্রমশ নির্মলের প্রতি আগে থাকতেই বিষিয়ে দিয়ে, একটা পূর্ব ক্ষেত্র রচনা করে রেখে কৌশলে বিনয়েন্দ্র নির্মলের হাত দিয়েই হত্যার অমোঘ অস্ত্র দুটি, টাইপ করা পত্রটি ও পার্শেলের মধ্যে একটি বিষ মাখানো ফিল্ম রোল্ হতভাগ্য নরেন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়েছিল। নরেন্দ্রনাথও তার ফটো তুলবার দুর্বলতায় সে বিষাক্ত টোপ সানন্দে গ্রহণ করে মৃত্যুকে বরণ করলেন। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। তাই চিঠির মধ্যে ভাঙ্গা টাইপের মোক্ষম প্রমাণ এত কাণ্ডের পরও থেকে গেল মৃত্যুর পশ্চাতে। হত্যা ব্যাপারটাকে ছক কেটে সাজাবার প্রচণ্ড উল্লাসে হিতাহিত জ্ঞান না হারিয়ে যদি বিনয়েন্দ্র সেই টাইপ করা চিঠিটা পূর্বেই সরিয়ে ফেলতো বিমলার সাহায্যে, তবে কারো সাধ্য ছিল না ঐ হত্যার কোন প্রমাণ তার বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর।

কিন্তু শ্রীনাথ করের ব্যাপারটা ?

সেটা বোধহয় প্রয়োজনের তাগিদে করতে হয়েছিল। শ্রীনাথ করই সম্ভবত ছিল নির্মলের প্রতি নরেন্দ্রনাথের মন ভাঙ্গানোর ব্যাপারে ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট। কাজেই কাজ হাসিলের পর তার সরে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি বলুন ? কিন্তু অতি লোভে হলো তাঁতী নষ্ট। নির্মলের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদে নরেন্দ্রর ব্যাপারটা যখন ধামাচাপা পড়ে গেল, বিনয়েন্দ্র তখন সম্পত্তি গ্রাস করবার লোভে বেবীকেও চিরতরে ইহজগত থেকে সরাবার মতলব করলে। আর সেইখানেই হলো তার সর্বাপেক্ষা বড় ভুল বা প্রমাদ। এক ভুল চালেই কিস্তিমাৎ হয়ে গেল। সুব্রত চুপ করলো।

॥ উনিশ ॥

ঐদিন সন্ধ্যার দিকে একটা জরুরী টেলিফোন কল্ পেয়ে সুব্রত যখন বেবীর ওখানে এসে হাজির হলো, বেবী তখন তার ঘরের মধ্যে একাকী বসে ছিল।

কি ব্যাপার? এত জরুরী ডাক।

আসুন একটা পরামর্শের জন্য ডেকেছি। বসুন—

বসতে বসতে সুব্রত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কি?

ভাবছি আমিও এ সম্পত্তি চাইনা সুব্রতবাবু।

সে কি!

হ্যাঁ, যে অর্থের পিছনে এত হত্যা, এত রক্তপাত, সে অভিশাপের বোঝা আর যেই বয়ে বেড়াক আমি অন্তত বয়ে বেড়াতে পারবো না।

বেবী!

হ্যাঁ, আমি মনস্থির করে ফেলেছি সুব্রতবাবু।

হঠাৎ এ বৈরাগ্য—

বৈরাগ্য কেন হবে। আপনিই বলুন তো, কি হবে এই অর্থ দিয়ে।

কি বলছো তুমি বেবী, অর্থই তো মানুষের জীবনে সব—

না। আমি এসব কিছুই চাই না—

এসব কিছুই চাও না—

না।

তবে কি চাও?

বেবী চুপ।

কি বল। চুপ করলে কেন?

বেবী মাথা নিচু করে।

সুব্রত ধীরে ধীরে উঠে এসে উপবিষ্ট আনতমুখী বেবীর কাঁধের উপর একখানি হাতের মৃদু স্পর্শ রেখে কোমল কণ্ঠে ডাকে, বেবী। সত্যিই আর তোমার কি কিছুই চাই না?

বেবী সহসা সোফার হাতলের 'পর মুখ গুঁজে কান্নায় যেন ভেঙ্গে পড়লো।

খোঁপাটা ভেঙ্গে সারা পিঠময় ছড়িয়ে পড়েছে। সেই চুলে আঙ্গুল বুলাতে বুলাতে সুব্রত আবার ডাকে, বেবী।

বেবী কাঁদছে, তবু কাদছে।

যেদিন আদালতের বিচারে মনোহরের সাত বৎসরের সশ্রম কারাবাসের রায় দিলেন বিচারক, সেইদিনই রাত্রে করবীর সঙ্গে নির্মলের বিবাহ।

ঘরের মধ্যে মালাচন্দন অলঙ্কার ভূষিতা করবী চিত্রকরা পিঁড়ির উপর বসেছিল।

বাইরে সানাই বাজছে।

সুব্রত এসে ঘরে ঢুকলো।

করবীদেবী।

কে, সুব্রতবাবু, আসুন—কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন অনিমেষবাবুর সব কথা আজ আমাকে বলবেন।

সেই জন্যই বিশেষ করে এসেছি করবীদেবী।—বলতে বলতে একটা খাম এগিয়ে দিল সুব্রত করবীর হাতে, এই নিন, এই চিঠি পড়লেই সব জানতে পারবেন। কিন্তু এখন না। বিয়ের পর রাত্রে বাসর ঘরে পড়বেন।

বেশ।—করবী চিঠিটা জামার মধ্যে রেখে দিল।

বাসর ঘর।

মৃদু নীলাভ আলোয় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নির্মল আর করবী চিঠিটা পড়ছিল।

সুচরিতাষু,

আজ আর আমি নেই তাই অসঙ্কোচে আমার অতীতের আমিকে আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। আপনি অনেকদিন আমার পরিচয়টা জানতে চেয়েছেন, কিন্তু দিইনি। বিশ্বাস করুন, দিইনি এইজন্য যে দেবার মত আমার কিছুই ছিল না। 'নাম গোত্র পরিচয়হীন—অনাথ আশ্রমে পালিত। তবু বয়েস হবার পর একদিন যখন জগতের সামনে মুখোমুখি দাঁড়ালাম, যেখানে কেউ আমার নেই, আমি কারো নই। জন্মমুহূর্তে পরিত্যক্ত আমি, দুনিয়ার চির পরিত্যক্ত। সেদিন কিন্তু অতটা দুঃখ হয়নি। কারণ তখন আমার একমাত্র প্রশ্ন সামনে, বাঁচতে হবে। বাঁচলাম—অর্থাৎ বেঁচে রইলাম। এবং সেই বাঁচার রস পেলাম আফিমের চোরা কারবারে। তাই ঐভাবে পলাতক সর্বদা সশঙ্কিত জীবন অন্ধকার ঘরে যাপন করতাম। কিন্তু যেদিন প্রথম সেই অন্ধকারে এক জ্যোতির্ময় আলোর শিখা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠলো, আমার বর্তমান ভূত ভবিষ্যৎ সব যেন পাল্টে গেল। যাক্ সে কথা। আমার একান্ত নিজস্ব হ্যাঁ, নিজস্ব কথা আমারই থাক। আমার নগদ কিছু টাকা ছিল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে। আপনার নামে সেটা আছে। সে টাকাটা নিলে সত্যিই বলছি আমার আত্মা পরিতৃপ্ত হবে। পরপার থেকে আপনাদের কুশল কামনা করবো।

করবী চিঠিটা শেষ করে নির্মলের দিকে তাকালো।

করবীর চোখে জল। সানাই তখনো বাজছে ক্লান্ত সুরে।

রাত্রির শেষ যাম প্রত্যুষের প্রত্যাশায় প্রহর গুণে চলেছে কেবল।

———